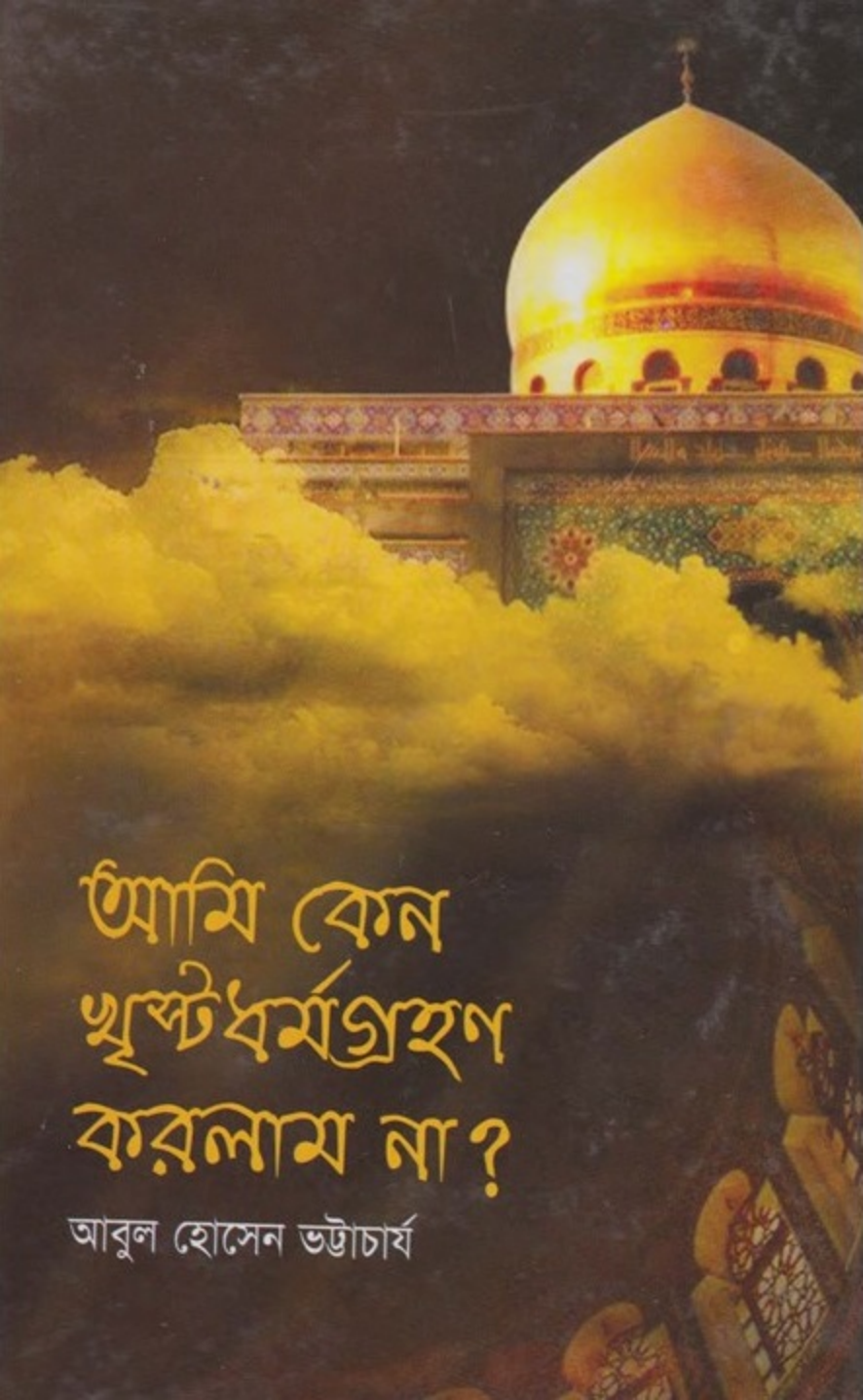

আমি কেন খৃস্টধর্মগ্রহণ করলাম না?

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য

আমি কেন খৃস্টধর্মগ্রহণ করলাম না?

www.icsbook.info

আমি কেন খৃস্টধর্মগ্রহণ করলাম না?

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য
(প্রাক্তন পুরোহিত)

জ্ঞান বিতরণী

www.icsbook.info

©
লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা-২০১০

প্রচ্ছদ
সুব্রত সাহা

প্রকাশক
মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম

জ্ঞান বিতরণী
৩৮/২-ক বাংলাবাজার মান্নান মার্কেট (৩য় তলা)
ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৭১৭৩৯৬৯

অক্ষরবিন্যাস
জন্মভূমি কালার স্পট

মুদ্রণ
ডি. এ. অফসেট প্রিন্টার্স
৩৭ প্যারীদাস রোড ঢাকা-১১০০

পরিবেশক
আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা
১৯১, মগবাজার ওয়ারলেস রেল গেট, ঢাকা

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

মূল্য
১২০.০০ টাকা U.S.$-5.00

Aami Keno Khrishto dhormo grohon Korlam Na?
(Why I didn't embress Christianity?)
By **Abul Hossain Bhattacherijee**
Published By Mohammad Shahidul Islam
Gyan Bitaroni, 38/-2ka Banglabazar
Dhaka-1100, Tel : 7173969

ISBN : 984-8747-69-9

www.icsbook.info

উৎসর্গ

অনুসন্ধিৎসু ভ্রাতা-ভগ্নিদের উদ্দেশ্যে–

– গ্রন্থকার

www.icsbook.info

www.icsbook.info

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আল্লাহতায়ালার অপার অনুগ্রহে প্রখ্যাত নওমুসলিম, এ উপমহাদেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, বিভিন্ন ধর্ম-তত্ত্বাভিজ্ঞ ও বিদগ্ধ সমালোচক জনাব আলহাজ্ব মওলানা আবুল হোসেন ভট্টাচার্যের সুদীর্ঘ চিন্তা ও গবেষণার ফল 'আমি কেন খৃস্টধর্মগ্রহণ করলাম না' শীর্ষক গ্রন্থটি অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বরের দিকে বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং দু'বছরের মধ্যেই সব কপি শেষ হয়ে যায়। দেশ-বিদেশের বহু শুভানুধ্যায়ী পাঠকের অনুরোধ সত্ত্বেও বইটি যথাসময়ে সুধী পাঠকমণ্ডলীর হাতে পৌঁছে দিতে পারিনি বলে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রকাশনা-উপকরণাদির উচ্চমূল্যের জন্য বইটির মূল্যও বাড়াতে হয়েছে। আশা করি, সুধী পাঠকমণ্ডলী এ মূল্য বৃদ্ধিকে সহানুভূতির সাথেই মেনে নেবেন।

নিজস্ব ছাপাখানা না-থাকার দরুন অন্যের প্রেসে আমাদের ছাপার যাবতীয় কাজ করে নিতে হয়। এ জন্যে আমাদের প্রায় প্রতিটি প্রকাশনাতেই কিছু মুদ্রণজনিত ত্রুটি থেকে যায়। একই কারণে এ পুস্তকটিতেও কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটে গেছে; তবে আগের চেয়ে এবারে অনেক কম বলে আমাদের বিশ্বাস।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অনুসন্ধিৎসু পাঠকমণ্ডলী ও ধর্মতত্ত্ব-গবেষকবৃন্দ যদি এ গ্রন্থটির দ্বারা সামান্যতমও উপকৃত হন, তাহলে আমাদের শ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক বলে ধরে নেবো।

১লা এপ্রিল, ১৯৮২ ইং
ইসলাম প্রচার সমিতি,
ঢাকা-৫

ইসমাঈল হোসেন দিনাজী
পরিচালক,
প্রকাশনা বিভাগ

www.icsbook.info

দ্বিতীয় প্রকাশ প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানিতে বইখানার দ্বিতীয় সংস্করণ বের করা সম্ভব হল। প্রথম সংস্করণের ভুল-ত্রুটি নিরসনের প্রচেষ্টাগ্রহণ করেও নানা কারণে সফল হতে পারিনি, সুধী পাঠকবর্গ এবারের ভুল-ত্রুটিগুলোকেও ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন বলে আশা করি।

সমাজে এ ধরনের বই-পুস্তকের খুবই অভাব। অথচ যোগ্যব্যক্তিগণ এ সম্পর্কে উদাসীন। যে দু'চারখানা বই চালু রয়েছে তার ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গৃহীত হলে সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে। দুঃখের বিষয় সেদিকেও যথাযোগ্যভাবে দৃষ্টি দেয়া হচ্ছে না। ফলে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়ে চলেছে এবং শেষ পরিণতি কি সেকথা ভাবতেও দেহ-মন অসার হয়ে পড়ে।

প্রকাশনা-সংকট অত্যন্ত প্রকট। এমতাবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোনও গ্রন্থ প্রকাশ করে সমাজের হাতে তুলে দেয়া দুঃসাধ্য। তাই এ গুরুভার বহনের দায়িত্ব নিয়েছে ইসলাম প্রচার সমিতি।

মানবতাকে অন্ধবিশ্বাসের নাগপাশ থেকে মুক্ত ও প্রাণবন্ত করে তোলার শপথ নিয়ে এগিয়ে আসার কাজে আমার এ প্রচেষ্টা সামান্যতম সহায়ক হলেও আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সত্য ও সুন্দরকে জানার এবং বোঝার তওফিক দান করুন। আমিন!

১লা এপ্রিল, ৮২ — বিনীত
ঢাকা — গ্রন্থকার

www.icsbook.info

পূর্বকথা

নানা কারণে পৈত্রিক ধর্মের প্রতি আস্থা হারানোর পর গ্রহণযোগ্য ধর্ম হিসেবে সর্ব প্রথমে যে ধর্মের কথা আমার মনে জেগে উঠেছিল তার নাম যে খৃস্টধর্ম 'আমি কেন ইসলামগ্রহণ করলাম' নামক পুস্তকের পাঠক মাত্রেরই সে কথা জানা রয়েছে।

যেসব কারণে সর্বপ্রথম খৃস্টধর্মের কথা আমার মনে জেগে উঠেছিল উক্ত পুস্তকে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর বিবেচনার জন্যে উক্ত কারণসমূহের কয়েকটিমাত্র নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা হল :

সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধারণা, বিশ্বাস, অভিমত, অভিরুচি প্রভৃতির গুরুত্ব ও মর্যাদা যে কত বেশি সেকথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না। আবহমানকাল যাবত সকল দেশের মানুষ কর্তৃক এ গুরুত্ব ও মর্যাদা স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে এবং পেতে থাকবে। খৃস্টধর্মের অনুসারীগণই পৃথিবীতে সর্বাধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ। অতএব তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস যে সবিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে সেকথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না।

ধন-দৌলত জ্ঞান-প্রজ্ঞা, মান-সম্ভ্রম, শিক্ষা-সভ্যতা প্রভৃতির দিক দিয়েও খৃস্টধর্মাবলম্বীরাই সর্বাধিক উন্নত ও অগ্রসর।

বিশ্বব্যাপী তাঁদের বিভিন্ন সেবাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেগুলোর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ অন্ধ-আতুর, রুগ্ন-বিকলাঙ্গ, দুঃস্থ-অনাথ প্রভৃতির সেবার কাজ তাঁরা অতীব নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে চালিয়ে যাচ্ছেন।

যুদ্ধ-বিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ-মহামারী, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও ধ্বংসলীলার খবর পাওয়ার সাথে সাথে খৃস্টধর্মাবলম্বী স্বেচ্ছা-সেবকেরাই ত্রাণ-সামগ্রী মাথায় নিয়ে সেখানে ছুটে গিয়ে প্রাণ ঢালা সেবা-যত্নের কাজে আত্মনিয়োগ করছেন।

খৃস্টধর্মাবলম্বীগণই পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছুটে গিয়ে ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র গড়ে তুলছেন, যুগোপযোগী ও সর্বাধিক উন্নত প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে সর্বসাধারণের কাছে খৃস্টধর্মের মাহাত্ম্যকে সার্থকভাবে তুলে ধরছেন। বিশেষ করে, এ সব কেন্দ্রের মাধ্যমে অজ্ঞ-অশিক্ষিত ও সভ্যতার আলোকবিবর্জিত

www.icsbook.info

মানুষদের ধর্মীয় আলোকে উদ্ভাসিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সর্বোপরি, খৃস্টধর্মের প্রচারকার্য যাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের যোগ্যতা, ত্যাগী মনোভাব, অমায়িক ব্যবহার, একনিষ্ঠতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি যে যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তিই সেকথা অস্বীকার করতে পারেন না।

মানুষ-মাত্রই সত্যানুসন্ধিৎসু। এ সত্যের সন্ধান করতে গিয়ে অনেকে তার সন্ধানও পায়। কিন্তু সে সত্যকে গ্রহণ করার জন্য যখনই স্নেহ-মমতার বাঁধন, আশ্রয়, সহায়-সম্পদ, জীবনের নিরাপত্তা প্রভৃতির প্রশ্ন দেখা দেয়, তখন অনেকের পক্ষেই সত্যকে গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ প্রশ্নগুলোর কথা বিবেচনা করে খৃস্টধর্মের অনুসারীগণ নব-দীক্ষিতদের পুনর্বাসন ও নিরাপত্তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

বলাবাহুল্য, গুণের জন্যই এক মানুষ অন্য মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। খৃস্টানদের উদ্যম, কর্মতৎপরতা, স্বাধীন ও শ্রমশীল মনোভাব, উদ্ভাবনী শক্তি, অনুশীলনপ্রিয়তা, প্রভৃতি গুণাবলী আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছিল।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে সময়ে খৃস্টানদের রাজ্যে সূর্য অস্তমিত হতো না। ভারতবর্ষের বুকেও তখন তাঁরা দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজ-ধর্মের প্রতি প্রজা সাধারণের শ্রদ্ধার ভাব থাকা ও তা গ্রহণ এবং গৌরবজনক মনে করাকে অন্যায় বলা গেলেও অস্বাভাবিক বলা যায় না। আর যায় না বলেই অতি প্রচ্ছন্নভাবে হলেও আমার মনে যে রাজ-ধর্মের কিছুটা প্রভাব পড়েছিল সেকথাও আমি অস্বীকার করতে পারি না।

উল্লেখিত কারণসমূহের জন্য খৃস্টধর্মের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আমি অনুভব করেছিলাম। কিন্তু ভালভাবে সবকিছু না জেনে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে আমি সংগত মনে করিনি। এবং সে কারণেই আমি যে জনৈক খৃস্টান বন্ধুর পরামর্শে তদানীন্তনকালে কলকাতার ইন্টালি এলাকায় বসবাসকারী রেভারেন্ড জন ফেইতফুল সাহেবের কাছে গিয়ে খৃস্টধর্ম সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করেছি। এমনকি, কিছু দিন যে গীর্জায়ও যাতায়াত করেছি 'আমি কেন ইসলামগ্রহণ করিলাম' নামক পুস্তকে সেকথার উল্লেখ রয়েছে।

মরহুম খানবাহাদুর আহছান উল্লাহ, মরহুম মওলানা আকরাম খাঁ এবং মরহুম খানবাহাদুর সৈয়দ হাতেম আলী প্রমুখের কাছে গিয়ে ধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার সুযোগও যে আমার হয়েছে উক্ত পুস্তকের সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছে সেকথা আর নতুন করে বলার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। তবে নতুন করে একথা বলার প্রয়োজন রয়েছে যে, মৌখিক আলাপ আলোচনা ছাড়াও মরহুম মওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'মোস্তফা চরিত' আমি পাঠ করি এবং তা থেকে খৃস্টধর্ম সম্পর্কে বহু মূল্যবান তত্ত্ব ও

www.icsbook.info

তথ্যাদি জানা আমার পক্ষে সম্ভব হয়। এ ব্যাপারে অন্য যে পুস্তকখানা আমার খুবই সহায়ক হয়েছিল, তা হল— মরহুম মুন্‌শী মেহের উল্লাহ সাহেবের লিখিত 'রদ্দে খৃস্টিয়ান'।

এ সময়ে বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে জানতে পারি যে, জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ কাব্যনিধি নামক জনৈক ব্যক্তি নিজের ধর্ম ছেড়ে খৃস্টধর্মগ্রহণ করেছিলেন এবং পরে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে আবার ইসলামে ফিরে এসেছেন।

তিনি কেন খৃস্টধর্মগ্রহণ করলেন আবার কেন-ইবা ফিরে এলেন সেকথা জানার জন্যে বিশেষ একটা আগ্রহ অনুভব করতে থাকি। কিন্তু বাংলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচারের জন্য সেসময়ে উক্ত বিদ্যাবিনোদ সাহেব এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁর নাগাল পাওয়াই আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। সে যাহোক, কিছুদিন চেষ্টার পরে সৌভাগ্যবশত তাঁর সাক্ষাত লাভে সক্ষম হই।

আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি যেসব কথা বলেছিলেন তার সার-সংক্ষেপ ছিল এরূপ— অসভ্য উপজাতীয় এবং অনুন্নত মানুষেরা যেসব দেশে রয়েছে সেসব দেশেই সাধারণত খৃস্টান মিশনারিদের তৎপর থাকতে দেখা যায়। সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত দেশগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলেও দেখা যাবে যে, অনুন্নত এবং নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা যেসব অঞ্চলে বেশি রয়েছে খৃস্টান মিশনারিরা সেসব অঞ্চলকেই তাঁদের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে নিয়েছেন।

অসভ্য লোকদের সভ্য করা বা অনুন্নতদের উন্নত করার প্রেরণা এর মাঝে আছে কি না জানি না, তবে কেউ যদি মনে করে যে, শিক্ষা-দীক্ষাহীন, ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত এবং উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের দ্বারা নিষ্পিষ্ট-নিপীড়িত এ সব মানুষদের অতি সহজেই দলে ভিড়ানো সম্ভব বলেই খৃস্টান মিশনারিরা ঐ এলাকাগুলোকে বেছে নিচ্ছেন তবে তাকে দোষ দেয়া যায় না।

এটাও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বহুসংখ্যক মিশনারি, বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় এবং বহু বছরের চেষ্টায় আজ পর্যন্ত দেশবরেণ্যদের একজনকেও তাঁরা খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হন নি, এমনকি মোটামুটিভাবে শিক্ষিত এবং সচেতন কোনও মানুষও আজ পর্যন্ত তাদের ধর্ম মেনে নেয় নি।

পক্ষান্তরে, মুসলমানদের চেষ্টা সাধনা ছাড়াই শুধু ইসলামের শিক্ষা ও সভ্যতায় মুগ্ধ হয়ে খৃস্টান-জগতের দিকপাল সদৃশ লর্ড হেডলে, ড. শেলড্রেক ডি-লিট, মি. ফ্রান্সিস ডি-মেলো, মি. কার্ডেল রায়ান প্রভৃতি ও আমেরিকার প্রখ্যাত ধনকুবের মি. রেকস্ ইনগ্রাম প্রমুখসহ শতশত খৃস্টান স্বেচ্ছায় ইসলাম-

www.icsbook.info

গ্রহণ করেছেন এবং করে চলেছেন। শুধু তা-ই নয়, ইসলাম প্রচারের জন্য মিশন, মিশনারি প্রভৃতি বলতে যা বোঝায় তার কোনটা-ই নেই, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা বা রাজশক্তিও নেই। তথাপি শুধু ইসলামের সত্যতার জন্য প্রতিবছর পৃথিবীর সকল বর্ণের, সকল ধর্মের এবং ধনী-দরিদ্র-ক্ষুদ্র-ভদ্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর হাজার হাজার মানুষ স্বেচ্ছায় এবং সাগ্রহে ইসলামগ্রহণ করে চলেছেন।

এ পর্যায়ে বিদ্যাবিনোদ সাহেব আলমারি খুলে 'তাবলীগ' নামক সংবাদপত্রের একটি সংখ্যা বের করে আনেন এবং তাঁর কথার সমর্থনে উক্ত সংবাদপত্রের একটি স্থানের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাতে আদমশুমারির বরাত দিয়ে ১৯০০ সাল থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে অর্থাৎ এ দশ বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী যেসব মানুষ ইসলামগ্রহণ করেছিল তার মোটামুটি একটা হিসেব তুলে ধরা হয়েছিল। সর্বমোট সংখ্যাটি ছিল ৭২,৩৩,৭৩৬। উক্ত সংখ্যাটির নীচে অঙ্গুলি স্থাপন করে তিনি বলেছিলেন, সংখ্যাটি মনে রাখতে চেষ্টা করবেন।

অতঃপর বিদ্যাবিনোদ সাহেব বলেছিলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের বড় বড় পণ্ডিতব্যক্তিদের যিনিই ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করেছেন তিনিই ইসলামের শিক্ষা, সৌন্দর্য এবং সত্যতায় মুগ্ধ হয়েছেন এবং হচ্ছেন। অবশ্য নানা কারণে এঁদের সকলের পক্ষে পৈত্রিক ধর্ম পরিত্যাগ করা সম্ভব হচ্ছে না। তা না হলেও ইসলামের মহান শিক্ষা, অনুপম সৌন্দর্য এবং অনাবিল সত্যতা সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করে চলেছেন। বলাবাহুল্য, এসব পণ্ডিতব্যক্তিদের মধ্যে অনেক খৃস্টানও রয়েছেন। তাঁদের অভিমতগুলো পাঠ করলেই খৃস্টানধর্ম সম্পর্কে একটা ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব।

তারপর তাদের মদ্যপান, জুয়াখেলা, বিলাসিতা, ব্যভিচার এবং সেই ব্যভিচারের ফলে কত সহস্র জারজ-সন্তান জন্ম নিচ্ছে এবং প্রতিবছর কত সহস্র ভ্রূণ হত্যার কাজ অবাধে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে এসব খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা ঐ সব ছোটখাটো গুণ দেখে আকৃষ্ট হতে পারেন না।

তাঁদের নিজেদের দেশেও যথেষ্ট গরীব-দুঃখী রয়েছে; পাপী-নরাধমদের সংখ্যাও সেসব দেশে মোটেই কম নয়। অতএব সেবা ও 'সুসমাচার' প্রচারের যথেষ্ট সুযোগ তো সেখানেই রয়েছে।

এমতাবস্থায় 'ঘর ছেড়ে পরের সেবায়' এমন মাতামাতির উদ্দেশ্য যে সাম্রাজ্যবাদের কদর্য চেহারাটা সুকৌশলে ঢেকে রেখে মতলব সিদ্ধি করা; অন্তত ভারতীয় মুসলমানদের সেকথা মোটেই অজানা নয়।

কোটি কোটি টাকার সম্পদ লুট করে এবং অসংখ্য অগণিত মানুষকে পথের ফকিরে পরিণত করে, যে পাপ তারা সঞ্চিত করেছেন এবং করে চলেছেন

www.icsbook.info

দু'চারটা সেবাপ্রতিষ্ঠান, আর ছিটে-ফোঁটা সাহায্য দিয়ে সে পাপ খণ্ডন করা সম্ভব নয় এবং সেবার নামে বোকা লোকদের ধোকা দেয়া সম্ভব হলেও তাদের মনে রাখা উচিত যে, সকল দেশেই চক্ষুষ্মান রয়েছেন এবং সর্বোপরি রয়েছেন বিশ্ববিধাতা। সুতরাং এসবের পরিণতি আজ হোক আর কাল হোক, তাদের ভোগ করতেই হবে এবং তা করতে হবে— অতি নির্মমভাবেই।

অতঃপর তিনি তাঁর সংরক্ষিত সংবাদপত্র ও সাময়িকী থেকে বিভিন্ন ধর্মের কতিপয় প্রখ্যাত ব্যক্তির ইসলাম সম্পর্কীয় অভিমত পাঠ করে শোনান এবং তাঁর নিজের লিখিত 'ইসলামী বক্তৃতা' ও জনাব শামসুর রহমানলিখিত 'নও-মোসলেমের আত্মকথা' নামক দু'খানা বই আমাকে পাঠ করতে দেন।

বিদায়ের সময়ে প্রয়োজনমত তাঁর সাথে দেখা করার উপদেশ দেন ও খৃস্টধর্ম সম্পর্কীয় কতিপয় বইপুস্তকের নাম-ঠিকানা লিখে নিতে বলেন।

উল্লেখ্য, ওখান থেকে ফিরে আসার সময় পথ চলতে গিয়ে বিদ্যাবিনোদ সাহেবের কথাগুলো, দশ বছরে বিভিন্ন ধর্মের ইসলামগ্রহণকারী মানুষদের সংখ্যা এবং ইংরাজ-রূপী খৃস্টানদের ভারতে আগমন, শঠতা-ষড়যন্ত্রের সাহায্যে শাসনক্ষমতা দখল ও অতি জঘন্য ধরনের শোষণ-নির্যাতন চালিয়ে যাওয়ার ঘটনাসমূহ পুনঃ পুনঃ আমার মনের পাতায় ভেসে উঠছিল আর পাশাপাশি ভেসে উঠছিল মহাত্মা যীশুখৃস্টের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বাণী সমূহের এ তিনটি বাণী— "কেউ যদি তোমার এক গালে চড় মারে তবে অন্য গালটিও তার দিকে ফিরিয়ে দাও" আর "তোমরা ঈশ্বর ও ধন এক সাথে এ উভয়ের দাস হতে পার না—" এবং "সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করা সম্ভব হতে পারে কিন্তু কোনও ধনী লোকের স্বর্গে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।"

সে যাহোক, পরবর্তী সময়ে ওসব বইপুস্তক ছাড়াও বাইবেল (পুরাতন ও নতুন নিয়ম) এবং অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কীয় কয়েকখানা গ্রন্থ পাঠ করার সুযোগ আমি গ্রহণ করি। তাছাড়া আরও কতিপয় প্রখ্যাত নও-মুসলিমের আত্মকথা এবং অমুসলিমদের ইসলাম সম্পর্কীয় অভিমত নানা সূত্র থেকে জানার সুযোগও আমার হয়েছিল।

মোটকথা, আমার সীমিত সাধ্যানুযায়ী আমি খৃস্টধর্ম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তই আমাকে গ্রহণ করতে হয়। কেন করতে হয় সেকথা বলার জন্যেই এ পুস্তকের অবতারণা।

কিন্তু তাই বলে কেউ যদি মনে করেন যে খৃস্টধর্মকে মিথ্যা বলার জন্যেই আমি কলম ধরেছি তবে তাঁকে নিরাশই হতে হবে। কেননা আমি যতদূর জানতে পেরেছি, তা থেকে বেশ নির্ভরশীলতার সাথেই বলতে পারি যে, খৃস্টধর্ম মিথ্যা নয়।

www.icsbook.info

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে মিথ্যাই যদি না হয়, তবে সে ধর্ম আমি গ্রহণ করলাম না কেন? উল্লেখ্য, এ প্রশ্নের উত্তর যথাস্থানে দেয়া হয়েছে। তবে সে উত্তরের পূর্বাভাসস্বরূপ এখানে এতটুকুই বলা যেতে পারে যে, আমার জানা মতে ধর্মটি সত্য। কিন্তু এক শ্রেণীর পাদ্রী-পুরোহিত এবং স্বার্থশিকারীদের বিশেষ একটি শ্রেণী সে সত্যকে সত্য হয়ে টিকে থাকতে দেয়নি। শুধু তা-ই নয়— অজ্ঞতা, কূপমণ্ডুকতা, হীনমনোবৃত্তি এবং স্বার্থান্ধতার জন্য তাঁরা ধর্মীয় পরিবেশটাকেই এমন জঘন্যভাবে ঘোলাটে এবং কলুষময় করে রেখে গেছেন যে, সে পরিবেশে সত্যকে সত্য করে উপলব্ধি করার মতো মন-মানসিকতাই গড়ে উঠতে পারছে না।

এ পূর্বাভাসটুকু দেয়ার পরে বলতে হচ্ছে যে, সত্যকে সত্যরূপে তুলে ধরার উদ্দেশ্য নিয়েই আমি কলম ধরেছি। কারও অনুভূতি বা ধর্মীয় বিশ্বাসে কণামাত্র আঘাত দেয়ার ইচ্ছা বা আগ্রহ আমার নেই। তথাপি নিজের অজ্ঞাতসারে অথবা অযোগ্যতার জন্য কারও মনে সামান্যতম আঘাত লাগার মতোও কিছু যদি লিখে থাকি, সেজন্যে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী।

খৃস্টধর্মের অনুসারীদের মধ্যে জ্ঞানী-গুণী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি যথেষ্টই রয়েছেন। মানব-প্রেম, উদারতা এবং পরমত-সহিষ্ণুতার দিক দিয়ে তাঁদের অনেকেই যে যীশুখৃস্টের মহান আদর্শের অনুসারী, অন্তত অনুসারী হওয়ার জন্যে যত্নবান, সে প্রমাণও অনুপস্থিত নয়। অতএব মূল নিবন্ধে আমার তুলে ধরা তত্ত্ব ও তথ্যাবলীকে অন্যান্যরা না হলেও অন্তত এ শ্রেণীর মানুষেরা যে উদার ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে পাঠ করবেন এবং যথাযথভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখবেন সে বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ়রূপেই আমি পোষণ করি।

আলোচনার সুবিধার জন্য আলোচ্য বিষয়কে ভিন্ন ভিন্ন ছয়টি ভাগে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক শিরোনাম দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে কতিপয় উপ-শিরোনামও ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু সত্য পথের সন্ধান-রত ব্যক্তিদের ইসলামগ্রহণের সংবাদ আমার মনে গভীর উৎসাহ এবং প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল অতএব প্রখ্যাত খৃস্টান মনীষীদের যাঁরা ইসলামগ্রহণ করেছেন তাদের কতিপয়ের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় এ পুস্তকের শেষদিকে 'খৃস্টান মনীষীদের দলে দলে ইসলামগ্রহণ' শিরোনাম দিয়ে তুলে ধরা হল :

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত বিদ্যাবিনোদ সাহেব দ্বিতীয় পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের কতিপয় প্রখ্যাত ব্যক্তির ইসলাম সম্পর্কীয় অভিমতের প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। আর সে অভিমতসমূহও আমার মনে গভীর রেখাপাতে সক্ষম হয়েছিল। অতএব এমনি ধরনের কয়েকটি অভিমতকে 'ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে খৃস্টান মনীষীদের সুচিন্তিত অভিমত'

www.icsbook.info

শিরোনাম দিয়ে সর্বশেষ নিবন্ধ হিসেবে তুলে ধরা হবে। যেহেতু খৃস্টধর্মের মূলশিক্ষা, বাইবেলের মৌলিকতা এবং তাতে সন্নিবেশিত বাক্যাবলীর যুগোপযোগিতা প্রভৃতি নিয়ে আমি পর্যালোচনা করেছিলাম অতএব পুস্তকের প্রথমেই যথাক্রমে 'গোড়ায় যদি গলদ থাকে' 'ইঞ্জিল-বাইবেল-সুসমাচার' এবং 'আসুন ভাল করে ভেবে দেখি' শিরোনাম দিয়ে আমার বক্তব্য তুলে ধরা হবে। তারপরে থাকবে 'উপসংহার'।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কারও মনে কণামাত্র আঘাত দেয়া বা কোন ধর্মের নিন্দা-কুৎসা প্রচারের সামান্যতম ইচ্ছা বা আগ্রহ আমার নেই। সত্যকে সত্য করে তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই আমি কলম ধরেছি।

এতদ্বারা সত্যকে সত্য করে তুলে ধরার কাজে কতটুকু সফল হয়েছি অথবা মোটেই হয়েছি কি না বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীই সে বিচার করবেন। যদি সফল হতে না পেরে থাকি সে ত্রুটি একান্তরূপেই আমার নিজস্ব। নিজের অজ্ঞতা-অযোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন থাকার পরও প্রয়োজনের তাগিদে একান্ত বাধ্য হয়েই এ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে কলম ধরতে হয়েছে। অতএব বইখানাতে নানা ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা খুবই স্বাভাবিক। আমার মনের দিকে চেয়ে সেগুলোকে ক্ষমার চোখে দেখলে আমি বিশেষভাবে বাধিত হব।

যোগ্য ব্যক্তিরা কাল বিলম্ব না করে এ কাজে এগিয়ে আসুন এবং সার্থকভাবে সত্যকে সত্যরূপে তুলে ধরুন সর্বান্তঃকরণে এ কামনাই করি।

প্রসঙ্গের উপসংহারে বলতে হচ্ছে যে, মানুষকে সত্যিকারের মানুষরূপে গড়ে ওঠার কাজে প্রেরণা ও উৎসাহ সৃষ্টি এবং যথাযোগ্য পথ-নির্দেশ দানই যে ধর্মের মূল লক্ষ্য এ সত্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আর বিভিন্ন ধর্ম-মতের অনুসারীরাও প্রত্যেকেই এটাই যে তাঁদের নিজ নিজ ধর্মের মূল লক্ষ্য অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সে দাবিও করে থাকেন। অথচ কার্যত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ গড়ার পরিবর্তে জঘন্য ধরনের অমানুষ গড়ে উঠছে; ধর্মীয় কোন্দল এক মানুষকে অন্য মানুষের প্রাণঘাতী শত্রুতে পরিণত করছে; এক ধর্মের নিন্দায় অন্য ধর্মের মানুষের পঞ্চমুখ হওয়াকে ধার্মিকতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলে অবলীলাক্রমে নিন্দা ছড়ানোর কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আমি মনে করি যে, সত্যকে সত্য করে জানার ত্রুটিই এসবকিছুর জন্য দায়ী। অতীতের সে অন্ধকার যুগে সত্যকে সত্য করে জানার পথে নানা অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতা বিরাজমান ছিল। সুতরাং সে সময় ধর্ম নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি এবং কোন্দল-কোলাহল অস্বাভাবিক ছিল না।

আজ বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকচ্ছটায় যখন চারিদিক উদ্ভাসিত, সে সময়ও যদি সত্যকে সত্য করে জানা এবং সে সত্যকে

www.icsbook.info

সর্বপ্রযত্নে আঁকড়ে ধরার কাজে আমরা অতীতের পুনরাবৃত্তিই ঘটাতে থাকি, তবে সেটা শুধু দুর্ভাগ্যজনকই হবে না তদ্বারা নির্মম ধ্বংসও নিশ্চিত এবং ত্বরান্বিত করে তোলা হবে।

অতএব আসুন! সত্যকে সত্য করে জানার চেষ্টা করি এবং সে সত্যকে সর্বোতভাবে আঁকড়ে ধরে নিজদের সত্যিকারের মানুষরূপে গড়ে তুলি। বিশ্বপ্রভু আমাদের একাজে সহায়ক হোন কায়মনোবাক্যে এ প্রার্থনাই করি।

নানারূপ প্রতিকূলতার জন্য পুস্তকখানার কলেবর প্রয়োজনমত বাড়ানো সম্ভব হল না। ফলে আমার সংগৃহীত অনেকগুলো তত্ত্ব ও তথ্যই অনুক্ত রয়ে গেল। বিশ্বপ্রভু যদি সময় ও সুযোগ দেন আগামীতে এ গ্রন্থটি বর্ধিত কলেবরে প্রকাশ করা হবে। এ ক্ষুদ্র পুস্তক যদি সমাজের সামান্যতম উপকারেও লাগে তবে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

www.icsbook.info

সূচিপত্র

গোড়ায় যদি গলদ থাকে	ঃ	১৯
ইঞ্জিল-বাইবেল-সুসমাচার	ঃ	২৭
আসুন ভাল করে ভেবে দেখি	ঃ	৬৪
উপসংহার	ঃ	৯৬
খৃস্টান মণীষীদের দলে দলে ইসলামগ্রহণ	ঃ	১০৫
ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে খৃস্টান মণীষীদের অভিমত	ঃ	১০৯

www.icsbook.info

www.icsbook.info

গোড়ায় যদি গলদ থাকে

'পূর্ব কথায়' উল্লেখিত প্রখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে আলাপ আলোচনার পর আমি বেশ ভালভাবেই অনুভব করেছিলাম যে, একটি গ্রহণযোগ্য ধর্ম খুঁজে বের করতে হলে অন্তত তিনটি বিষয়ের প্রতি সমধিক গুরুত্ব দিয়ে আমার এ অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। আর সে বিষয় তিনটি হল— তার উৎস এবং মৌলিকতা সন্দেহ-মুক্ত কি না, সর্বজনীন কি না এবং তার শিক্ষা যুগের উপযোগী কি না।

অন্তত ধর্মের ব্যাপারে কেন এ তিনটি বিষয়ের প্রতি সমধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন, বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর সেকথা অবশ্যই বেশ ভালভাবে জানা রয়েছে। কিন্তু সাধারণ পাঠকদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছেন এ সম্পর্কে যাঁদের ধ্যান-ধারণা খুব স্বচ্ছ নয়। অন্তত তাঁদের অবগতির জন্য এ তিনটি বিষয় সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন, যদিও বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর কাছে তা অপ্রয়োজনীয়; হয়তো বা বিরক্তিকরও বিবেচিত হতে পারে।

নিম্নে অতি সংক্ষেপে এ তিনটি বিষয় সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতে গিয়ে প্রথমে 'মৌলিকতা' উপ-শিরোনাম দিয়ে উৎস বা গোড়ার কথা এবং পরে যথাক্রমে 'সর্বজনীনতা' এবং 'যুগোপযোগিতা' উপ-শিরোনাম দিয়ে অন্য বিষয় দু'টিকে তুলে ধরা হলো।

মৌলিকতা

কোনও কিছুর গোড়ায় যদি গলদ থাকে তবে তা যত সুন্দর ও যত চাকচিক্যপূর্ণই হোক না কেন গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অতএব কোনও কিছুকে জানতে হলে প্রথমেই তার গোড়া বা উৎস সম্পর্কে জানার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বলাবাহুল্য, ধর্মের বেলায়ও এর কোনও ব্যতিক্রম থাকতে পারে না। বরং যেহেতু ধর্ম অত্যন্ত জটিল ও সুক্ষ্ম বিষয়, আর যেহেতু মানুষের দেহ-আত্মা ইহকাল-পরকাল প্রভৃতি সবকিছুর সাথে ধর্মের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, অতএব ধর্ম সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হয়। আর

www.icsbook.info

তা দিতে হলে ধর্মের গোড়া বা উৎসের সন্ধানকেও সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ উৎস বা গোড়া সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে যে কথাগুলো আমার মনে বিশেষভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা মোটামুটি ছিল নিম্নরূপ :

০ যিনি এ বিশ্বের, বিশেষ করে মানবমণ্ডলীর স্রষ্টা একমাত্র তিনিই সম্যকরূপে অবহিত রয়েছেন বা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্যকরূপে অবহিত থাকা সম্ভব যে, কি বিশেষ উদ্দেশ্যে বা কোন বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্যে তিনি মানবমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন। আর কোন পথে বা কি উপায়ে মানবের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সম্পাদিত হতে পারে সেকথাও একমাত্র তিনিই সম্যকরূপে অবহিত রয়েছেন বা সম্যকরূপে অবহিত থাকা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

যেহেতু তিনি শুধু স্রষ্টাই নন, বিশ্বনিখিলের একমাত্র প্রভু, একমাত্র মালিক এবং একমাত্র পরিচালকও তিনিই; অতএব এ পরিচালনা, নির্দেশদান, বিধি-নিষেধের আরোপ এবং তিরস্কার-পুরস্কার প্রদানের যোগ্যতা এবং অধিকারও একমাত্র তাঁরই রয়েছে। আর তা-ই সংগত এবং স্বাভাবিক।

০ যেহেতু একমাত্র তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, অন্য-নিরপেক্ষ, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সকলপ্রকার ভুল-ত্রুটি, অভাব-অভিযোগ, অযোগ্যতা, অক্ষমতা প্রভৃতি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও স্বাধীন। অতএব মানুষের জন্য নির্ভুল, নিরপেক্ষ, ত্রুটিহীন এবং সর্বজনীন বিধি-বিধান রচনার যোগ্যতা এবং অধিকারও একমাত্র তাঁরই রয়েছে।

বলাবাহুল্য, এ চিন্তাধারা থেকে এটা সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা আমার পক্ষে সহজ ও সম্ভব হয়েছিল যে, ধর্মীয় বিধানের গোড়া বা উৎস একটি-ই। অর্থাৎ বিশ্বপতি স্বয়ং। উল্লেখ্য, তিনি যে বিধান-দাতা তাঁর 'বিধাতা' নামটিই সে কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করছে। অতএব ধর্মের গোড়া বা উৎস যে তিনি-ই সে সম্পর্কে আর কোনও সন্দেহই থাকছে না।

এখানে সাথে সাথে অন্য যে কথাটি বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হলো: যেহেতু তিনিই একমাত্র প্রভু এবং যেহেতু বিধান দেয়ার যোগ্যতা এবং অধিকারও একমাত্র তাঁরই রয়েছে, আর যেহেতু প্রভুর বিধান সর্বোতভাবে মেনে চলা ছাড়া দাসের আর কোনও কর্তব্যই থাকতে পারে না— অতএব অন্য কারো বিধানকে বিধান বলে স্বীকার ও বিশ্বাস করা বা মেনে চলার কোনও সুযোগ এবং কোনও অধিকারই কোনও মানুষের থাকতে পারে না।

গোড়ায় গলদ থাকা সম্পর্কে এখানে এ প্রশ্নটি দেখা দেয়া খুবই স্বাভাবিক যে, যেহেতু ধর্মের গোড়া বা উৎস হলেন স্বয়ং বিশ্ববিধাতা; এমতাবস্থায় এমন

www.icsbook.info

মহান উৎস থেকে উৎসারিত হওয়া সত্ত্বেও তাতে অর্থাৎ তার গোড়ায় কি করে গলদ থাকতে পারে?

বলাবাহুল্য, প্রশ্নটি খুবই জটিল, সুতরাং দু'চার কথায় এর উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। আর সে যোগ্যতাও আমার নেই। তবে সাধ্যানুযায়ী খোঁজ-খবর নেয়ার পরে ধর্মের মৌলিকতা ক্ষুণ্ন হওয়া সম্পর্কীয় ঘটনাসমূহের যে বাস্তব-চিত্র সেদিন আমার কাছে ফুটে উঠেছিল, চিন্তার খোরাক স্বরূপ সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছে তা তুলে ধরছি।

(ক) সেদিন এমন ধর্মেরও সন্ধান আমি পেয়েছি, যেগুলো একান্তরূপেই মানুষের কল্পনা-প্রসূত। অর্থাৎ— ধর্মের আসল উৎস বা বিশ্ববিধাতার সাথে ওগুলোর কোনও সম্পর্কই নেই। অন্য কথায়, গলদের ওপরেই যেগুলোর গোড়া বা ভিত্ গড়ে উঠেছে বা গড়ে তোলা হয়েছে।

(খ) এমন ধর্মও রয়েছে, যেগুলোর গোড়ায় কোনও গলদ ছিল না। অর্থাৎ— সেই মূল উৎস থেকেই উৎসারিত হয়েছিল। কিন্তু, প্রাচীনত্ব, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির নাশকতামূলক কার্যকলাপ বা ধ্বংসলীলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সংরক্ষণের ত্রুটি, ধর্ম সম্পর্কে উদাসীনতা প্রভৃতি নানা কারণে সেগুলোর মৌলিকতা এমনভাবেই ক্ষুণ্ন হয়েছে যে, ওগুলোর মূল শিক্ষা কি ছিল, সেকথা জানার কোনও উপায়ই আজ আর অবশিষ্ট নেই।

(গ) কপট-বিশ্বাস, অজ্ঞতা-অযোগ্যতা এবং ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবনে অক্ষম এক শ্রেণীর পাদ্রী-পুরোহিত এবং এক শ্রেণীর স্বার্থ-সর্বস্ব মানুষের ঘৃণ্য তৎপরতার ফলে ছাঁটাই-বাছাই হতে হতে কোনও কোনও ধর্ম গ্রন্থ আজ 'ঠুঁটো জগন্নাথে' পরিণত হয়েছে।

(ঘ) শাসন-ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ, প্রাধান্য-পিয়াসী যাজক-সম্প্রদায়, সহজ পথে ও স্বল্প সময়ে জনপ্রিয়তা অর্জনে অভিলাষী ব্যক্তিদের একটি বিশেষ শ্রেণী কোনও কোনও ধর্মকে যে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে নানা ভাবে বিকৃত, ও অতিরঞ্জিত করেছে তেমন প্রমাণেরও অভাব নেই।

(ঙ) সুদূরের সেই অন্ধকার যুগে গড়ে ওঠা কুসংস্কার, অন্ধ-বিশ্বাস, কূপমণ্ডুকতা প্রভৃতি এবং সেকালের যুক্তিহীন প্রথা-পদ্ধতিসমূহ বংশানুক্রমিকভাবে নিজেদের মন-মস্তিষ্কের সাথে বহন করে এনেছেন এমন এক শ্রেণীর পণ্ডিত ব্যক্তি ধর্ম-বিধানের ব্যাখ্যা করতে ও ভাষ্য দিতে গিয়ে কেউবা স্বেচ্ছাকৃতভাবে আর কেউবা অসতর্কতাবশত তার মাঝে নানা ধরনের আজগুবী, অবিশ্বাস্য এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কথা-কাহিনী এমনভাবেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন যে, আজ আর সেগুলো পৃথক করা সম্ভবই নয়।

www.icsbook.info

(চ) অনাশক্তি এবং আত্মিক উন্নতির গূঢ়তত্ত্ব অনুধাবনে অক্ষম অথবা ভ্রান্ত বা বিকৃত ধারণা পোষণকারী এক শ্রেণীর তথাকথিত ধার্মিক ব্যক্তি ধর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানুষের মন-মগজে বৈরাগ্যবাদ এবং আধ্যাত্মিকবাদের নামে এক ধরনের উৎকট চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে প্রকৃতপক্ষে ধর্মের গোড়ায় কুঠারাঘাত করেছেন।

(ছ) ধর্মীয় বিধানে স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বরূপ, শক্তিমত্তা প্রভৃতি সম্পর্কে যেসব বর্ণনা রয়েছে, সেগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবনে অক্ষম এক শ্রেণীর মানুষ ধর্মের ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে একত্ববাদ, দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, অবতারবাদ, সাকারবাদ, নিরাকারবাদ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী নানা বাদের হট্টগোল সৃষ্টি করে ধর্মের মূল শিক্ষাকেই বিকৃত, বিভ্রান্তিকর এবং অবোধগম্য করে তুলেছেন।

(জ) যেহেতু ধর্ম একান্তরূপেই বিশ্বাসের বিষয়, আর যেহেতু সংশয়-সন্দেহের কণামাত্র অবকাশ থাকলে কোনও কিছুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন সম্ভব নয়, অতএব ধর্মীয় বিধানকে সকল প্রকার সংশয়-সন্দেহ থেকে মুক্ত ও নিরাপদ রাখার প্রয়োজন যে কত বেশি সেকথা সহজেই অনুমেয়।

বলাবাহুল্য, নানা কারণে এসব সংশয় সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। তার মধ্যে মৌলিকতার প্রশ্নটিই প্রধান। আর মৌলিকতা বলতে সাধারণত একথাই বোঝায় যে, তা বিশ্ববিধাতা কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে কি না এবং যেমনটি প্রদত্ত হয়েছিল ঠিক তেমনটিই আছে কি না আর এই তেমনটিই থাকার জন্যে একান্ত অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন হয় তার প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অক্ষর এমনকি ছোট বড় প্রতিটি বিরাম-চিহ্নকে হুবহু অর্থাৎ যথাযথ ও স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের।

কেননা, যেকোনও বাক্যের যেকোনও শব্দ, যেকোনও একটি অক্ষর এমনকি যেকোনও একটি বিরাম চিহ্নও যদি কোনও কারণে অদৃশ্য বা এদিক ওদিক হয়ে পড়ে অথবা বাইরে থেকে সেরূপ কোনও কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটে তবে বাক্যটি তাৎপর্যহীন, দুর্বোধ্য, অবোধগম্য এমনকি বিপরীতার্থ-বোধক হয়ে পড়াও মোটেই বিচিত্র নয়।

যেহেতু ধর্মীয় বাণী-বাহকের তিরোধানের সাথে সাথেই বিশ্ববিধাতার সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তখন আর ধর্মীয় বিধানের কোনওরূপ সংশোধন সম্ভব হতে পারে না অতএব তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁর নিজের দ্বারা, অন্যথায় তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যোগ্য এবং বিশ্বস্ত লোক বা লোকদের দ্বারা এ সংরক্ষণের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়া যে একান্তরূপেই প্রয়োজন সে কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

www.icsbook.info

অথচ পৃথিবীতে এমন ধর্ম-বিধানের সংখ্যা মোটেই অল্প নয়, যেগুলোর বেলায় বাণী-বাহকের জীবদ্দশায় তো নয়-ই এমনকি তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরও তাঁর মাধ্যমে সমাগত বাণীসমূহ সংরক্ষণের কোনও উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। ফলে যখন উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে তখন দেখা গিয়েছে যে, স্মৃতির সাহায্যে সংরক্ষণকারীদের কোনও কোনও ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন, কেউ কেউ কোনও কোনও কথা ভুলে গিয়েছেন, কেউ কেউ বিস্মৃত কথাগুলো পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে আন্দাজ-অনুমানের ওপর নির্ভর করেছেন। আর কেউ কেউ বা বিশ্বপ্রভুর বাণীর সাথে নিজের মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন। আর এমনিভাবে সত্য-মিথ্যা, আন্দাজ-অনুমান, ব্যক্তি বিশেষের মন্তব্য-বিবৃতি প্রভৃতির মিলিত এক অভিনব সংস্করণকে বিশ্বস্রষ্টার পবিত্র মুখ-নিসৃত বলে সমাজে চালু করে দেয়া হয়েছে।

(ঝ) পৃথিবীর সকল ভাষায়ই এমন অনেক শব্দ থাকে যেগুলো দ্ব্যর্থ-বোধক বা একাধিক ভাব-প্রকাশক। এমতাবস্থায় ধর্মীয় বাণীবাহক স্বয়ং ধর্মীয় কোন বাণীটির বেলায় সেরূপ কোন শব্দটির কি তাৎপর্য গ্রহণ করেছেন সেটা জানা না থাকলে নানারূপ ভুল বোঝাবুঝি বা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়া এমনকি সংশ্লিষ্ট ধর্ম-গ্রন্থটি সম্পর্কেই সংশয়-সন্দেহের বিষবাষ্প জমে ওঠা মোটেই বিচিত্র নয়।

সে কারণেই ধর্মীয় বাণী-বাহক কর্তৃক কোন বাক্যের বা কোন শব্দের কি তাৎপর্য গৃহীত হয়েছে তার বিশ্বাসযোগ্য তথ্য-প্রমাণাদি সহকারে গোটা ধর্মীয় বিধানটিরই ব্যাখ্যা-ভাষ্যকে এমনভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়ে থাকে, যাতে কোনও সময় তার ওপর বাইরের কোনও হস্তক্ষেপ হতে না পারে বা তেমন কোনও প্রয়োজনই দেখা না দেয়।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, যেসব ক্ষেত্রে ধর্মীয় বাণী বাহকগণ তাঁদের মাধ্যমে সমাগত মূলবাণীসমূহই যথাযথভাবে সংরক্ষিত করে যেতে পারেন নি বা তেমন সুযোগ পাননি, সেসব ক্ষেত্রে ওসব বাণীর ব্যাখ্যা, ভাষ্য প্রদানের সুযোগ যে তাঁরা পেয়েছিলেন সেকথা খুব নির্ভরতার সাথে বলা চলে না।

আর তাঁদের দ্বারা ব্যাখ্যা-ভাষ্য, প্রদত্ত হয়ে থাকলেও যেখানে মূল বাণীসমূহের সংরক্ষণের উদ্যোগই গৃহীত হয়েছিল বাণী বাহকদের তিরোধানের অনেক পরে, সেখানে ব্যাখ্যা-ভাষ্যাদি সংরক্ষণের উদ্যোগ গৃহীত হতে যে আরও অনেক বিলম্ব হয়েছিল সেকথা অনুমান করা খুব কঠিন নয়।

আর এ বিলম্বের মাত্রা ও পরিমাণ যত বেড়েছে মুনি এবং সন্যাসীদের সংখ্যাও যে ততই বৃদ্ধি পেয়েছে সেকথাও অতি সহজেই অনুমান করা চলে।

www.icsbook.info

আর মুনি এবং সন্যাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিণাম যে কি, সে কথাও আশা করি পাঠকবর্গের বেশ ভালভাবেই জানা রয়েছে।

(ঞ) সুদূর অতীতে লেখ্যভাষা উদ্ভাবিত হওয়ার পূর্বে যেসব ধর্মীয় বাণীর অবতারণ ঘটেছে বোধগম্য কারণেই শ্রুতি ও স্মৃতির সাহায্যে সেগুলো সংরক্ষিত করতে হয়েছে। বহুকাল, ক্ষেত্র-বিশেষে হাজার হাজার বছর পর যখন লেখ্যভাষা উদ্ভাবিত হয়েছে তখন ওগুলো লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে, স্মৃতির সাহায্যে সংরক্ষণকারীদের অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন, কেউ কেউবা অসুস্থতা অথবা বার্ধক্যের কারণে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন।

স্বাভাবিক ভুল প্রবণতার জন্যে কেউ কেউ সংরক্ষিত বাণীর কোনও কোনওটিকে স্মৃতিতে ধরে রাখতে সক্ষম হননি। এমন প্রমাণও রয়েছে যে, স্মৃতি থেকে এ সব ধর্মীয় বাণীর পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে এই শ্রেণীর স্মৃতিধরগণ অনেকেই আন্দাজ অনুমানের আশ্রয় নিয়ে ধর্মীয় বাণীর সাথে কোনও কোনও কথা জুড়ে দিয়েছেন। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে এদের নিজস্ব মন্তব্যকে মূলবাণী বলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ভণ্ড, কপট-বিশ্বাসী এবং ছদ্মবেশী শত্রুরাও যে এ সুযোগে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে গিয়ে ধর্মীয় বিধানের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করেছে তেমন প্রমাণেরও অভাব নেই।

বিভিন্ন ধর্মের মৌলিকতা কিভাবে ক্ষুণ্ন ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়েছে সেকথা বোঝাবার জন্য আর অধিক তথ্য তুলে ধরার প্রয়োজন হবে না বলেই মনে করি। অতঃপর দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ ধর্মের সর্বজনীনতা সম্পর্কে কিছুটা আভাস দেয়া যাচ্ছে :

তবে কেউ কেউ হয়তো ধর্মগ্রন্থের এই অঙ্গহানি এবং তার মাঝে এমন ধরনের আজগুবী-অবিশ্বাস্য ও প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কল্প-কাহিনীর সমাবেশ দেখে বিস্মিত অভিভূত হন, মনে মনে হয়তো এগুলো অন্যায় এবং মিথ্যা বলেও ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু একান্তই ধর্মসংক্রান্ত বিষয় বলে মুখ ফুটে কিছু বলেন না— বলতে পারেন না।

তাঁদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, এসব অন্যায় এবং অস্বাভাবিক হলেও অপ্রত্যাশিত নয়। কেননা, কারণ যা-ই হোক, গোড়ায় যদি গলদ থাকে তবে সে গলদের প্রভাবে তার দেহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো অদ্ভূত-অবিশ্বাস্য এবং কিম্ভূতকিমাকার ধরনের হয়ে গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক।

তাছাড়া, যে জিনিস যত বেশি ভাল এবং যত বেশি মূল্যবান সে জিনিস যদি পঁচে যায় তবে তার দুর্গন্ধও তত বেশি হয়ে থাকে। আর তজ্জনিত ক্ষয়-ক্ষতির

www.icsbook.info

পরিমাণও বেশি ছাড়া কম হয় না। এমতাবস্থায় ধর্মীয় বিধানের মত এমন পবিত্র, এমন মুল্যবান এবং এমন মর্যাদাপূর্ণ জিনিসের পচন ধরলে কি অবস্থা হতে পারে সে অনুমান করা কঠিন হতে পারে, কিন্তু অসম্ভব নয়।

সর্বজনীনতা

আমরা জানি এবং বেশ ভালভাবেই জানি যে, সত্য মাত্রই সনাতন, চিরন্তন এবং সর্বজনীন। তাকে কোনও ব্যক্তি, দল, সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সম্পদে পরিণত করা যায় না অথবা নির্দিষ্ট কোনও ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যেও আবদ্ধ রাখা যায় না। কেননা, সত্য আবিস্কৃত হওয়ার সাথে সাথেই তা সকল মানুষের সাধারণ সম্পদে পরিণত হয়ে যায়।

অতএব যেকোনও অবস্থায়, যেকোনও পর্যায়ে এবং যেকোনও অজুহাতে তাকে কুক্ষীগত করে রাখার অর্থই যে অপরের ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার অতি নির্মমভাবে পদদলিত করা সে সম্পর্কে দ্বিমতের কোনও অবকাশই থাকতে পারে না।

যেহেতু, ধর্ম একটি সত্য ব্যতীত কিছু নয়, অতএব এটা কুক্ষীগত করে রাখার অধিকার কারও থাকতে পারে না। যদি রাখা হয় তবে বুঝতে হবে যে, তদ্বারা অপরের ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত অধিকারই অতি নির্মমভাবে পদদলিত করা হয়েছে; অথবা উক্ত ধর্মের সাথে সত্যের কোনও সম্পর্কই নেই।

যুগোপযোগিতা

যুগের দাবি অস্বীকার করে পৃথিবীতে টিকে থাকা যে সম্ভবই নয়, সেকথা কোনও শিক্ষিত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে খুলে বলার প্রয়োজন হয় না।

এমতাবস্থায় ধর্মীয় বিধি-বিধানসমূহ যদি যুগের চাহিদা অনুযায়ী পথ-নির্দেশ দিতে না পারে তবে বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন সম্ভব হতে পারে না। আর বাস্তব জীবনে প্রতিফলনই যদি সম্ভব না হল তবে তেমন পোশাকী ধর্মের কোনও প্রয়োজনও থাকতে পারে না। শুধু তা-ই নয়, সে অবস্থায় ধর্ম এক দূরপণেয় বোঝায় পরিণত হয়।

কথাটি এভাবেও চিন্তা করা যেতে পারে যে, মানুষ একটি প্রগতিশীল জীব, অর্থাৎ এগিয়ে চলাই তার কাজ। একদিন গুহাজীবন থেকে যাত্রা শুরু করে আজ অনন্ত মহাশূন্যে পাড়ি জমানো থেকেই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

www.icsbook.info

এমতাবস্থায় মানুষ তার স্বভাবসুলভ প্রেরণায় এগিয়ে যেতে থাকবে আর ধর্ম হাজার হাজার বছর পশ্চাতে পড়ে থেকে পিছু টেনে তার এগিয়ে চলার গতি থামিয়ে দেবে অথবা ব্যহত-বাধাগ্রস্থ করবে, এমন ধর্মকে নিজেদের এগিয়ে চলা বা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অলঙ্ঘ্য তাকিদেই যে মানুষ মানতে পারে না, মানা যে সম্ভব নয় সে কথাটা বুঝবার জন্যে অনেক বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

উপসংহারে এ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। অতএব এখানে শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হচ্ছি যে, যুগোপযোগিতা হারানোর জন্যই পৃথিবীর প্রায় সবধর্মের মানুষই বাধ্য হয়ে নিজেরা আজ ধর্মনিরপেক্ষতার রক্ষাকবচ ধারণ করেছে এবং তাদের অচল ধর্মকে উপাসনালয়ের মধ্যে বন্দী করা ছাড়া আর কোনও গত্যন্তরই খুঁজে পাচ্ছে না।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, পরবর্তী আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য ওপরের এ কথাগুলোকে মনে রাখার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। অন্তত এ কথা কয়টি কিছুতেই ভুলে যাওয়া চলবে না যে, "যেহেতু সত্য-মাত্রই সনাতন, চিরন্তন এবং সর্বজনীন, আর যেহেতু ধর্মও একটি সত্য ব্যতীত কিছু নয়; অতএব ধর্মকেও অবশ্যই সনাতন, চিরন্তন, সর্বজনীন এবং যুগোপযোগী হতে হবে; অন্যথায় তা ধর্ম হতে পারে না, হওয়া সম্ভবই নয়।" আর সাথে সাথে একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, যে-ধর্মের মৌলিকতায় সন্দেহ রয়েছে এবং যে-ধর্ম সর্বজনীন এবং যুগের উপযোগী নয়, তা আঁকড়ে থাকা শুধু আত্মপ্রবঞ্চনাই নয়, আত্মহত্যারও শামিল।

সে যাহোক, ধর্মের মৌলিকতা এবং সর্বজনীনতা কিভাবে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে, আর কিভাবে পৃথিবীর প্রায় সব ধর্মই তাদের যুগোপযোগিতা হারিয়ে ফেলে অচল-অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে তার কতিপয় বাস্তব নির্দশন সহৃদয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পরবর্তী নিবন্ধে তুলে ধরা হল।

www.icsbook.info

ইঞ্জিল-বাইবেল-সুসমাচার

নামই পরিচয়

নাম দিয়েই ব্যক্তি, বস্তু, স্থান প্রভৃতির পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। বলাবাহুল্য, যথাক্রমে বহু বস্তু, বহু ব্যক্তি এবং বহু স্থানের প্রত্যেকটিকে পৃথক, স্বতন্ত্র এবং সুনির্দিষ্টরূপে বোঝানোর জন্যই ভিন্ন ভিন্ন নামের প্রয়োজন হয়ে থাকে। সে কারণেই নামটিকে অর্থপূর্ণ এবং উপযোগী হতে হয়। অর্থাৎ নাম শোনার সাথে সাথেই শ্রোতা যেন নির্দিষ্ট বস্তু, ব্যক্তি বা স্থানটি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণায় উপনীত হতে সক্ষম হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, 'সোনার পাথরের বাটি' বা 'কাঁঠালের আমস্বত্ব' ধরনের নাম শুধু অর্থহীনই নয়, রীতিমত বিভ্রান্তিকরও।

এ কারণেই কোন ভাষার কোনও বাক্যকে অন্য কোনও ভাষায় অনুবাদ বা রূপান্তরিত করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ, সম্মানীয় বা ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে এমন কোনও ব্যক্তি, বস্তু অথবা স্থানের নামকে অপরিবর্তিত রাখা হয়ে থাকে; ব্যাকরণের নিয়মও এটাই।

উদাহরণস্বরূপ আরবি ভাষার শহীদুল্লাহ্ শব্দটিকে তুলে ধরা যেতে পারে। উল্লেখ্য, ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য বিধায় ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মানুযায়ী বাংলা বা অন্য কোনও ভাষায় শহীদুল্লাহ্ শব্দটির কোনও প্রতিশব্দ নেই বা থাকতে পারে না। কেউ যদি এ চিরাচরিত প্রথা এবং ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করতে এবং জোরপূর্বক বাংলাভাষায় এর একটা প্রতিশব্দ উদ্ভাবন করে নিতে ইচ্ছা করেন তবে 'বলীশ্বর' শব্দটিকেই তিনি হয়তো পছন্দ করবেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এ নামে সারা জীবন চিৎকার করেও তিনি শহীদুল্লাহ্র দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং তাকে কাছে ভিড়াতে পারবেন কি না? অথবা শহীদুল্লাহর পরিচিত মহলে গিয়ে শত চেষ্টা করেও তিনি 'বলীশ্বর'-কে খুঁজে পাবেন কি না? তাছাড়া এও হতে পারে যে, এ নাম পরিবর্তনের জন্যে তিনি শহীদুল্লাহ্র বিরাগভাজনও হতে পারেন।

এ ছোট্ট পটভূমিকাটুকুর পর অত্র নিবন্ধের শিরোনাম হিসেবে ব্যবহৃত শব্দত্রয় নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। বলাবাহুল্য, বাইবেল, ইঞ্জিল এবং সুসমাচার এ শব্দ তিনটিই নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বা হয়ে আসছে। যদিও শব্দ তিনটি শোনার সাথে সাথে পৃথক পৃথক তিনটি নাম বলে মনে হওয়াই

www.icsbook.info

স্বাভাবিক, কিন্তু আসলে তা পৃথক পৃথক নয়, একটি গ্রন্থেরই তিন ভাষার তিনটি নাম।

নামের পরিবর্তন

যদিও গ্রন্থখানা 'বাইবেল' নামেই সুপরিচিত হয়ে পড়েছে অথবা সুপরিচিত করে তোলা হয়েছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা এর আসল নাম নয়। মূল গ্রন্থখানা হিব্রুভাষায় লিখিত এবং উক্ত ভাষায় এর আসল নাম হল 'ইঞ্জিল'। ইংরাজী এবং বাংলাভাষায় অনুবাদ করে এর নাম রাখা হয়েছে যথাক্রমে 'বাইবেল' এবং 'সুসমাচার'।

বলাবাহুল্য, ইঞ্জিল নামক গ্রন্থখানার যেকোনও ভাষায় অনুবাদ হতে পারে, তা নিয়ে কারও কোনও আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু চিরাচরিত প্রথা এবং ব্যাকরণের সুস্পষ্ট নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করে অনুবাদের অজুহাতে প্রকৃতপক্ষে মূল গ্রন্থখানায় উল্লেখিত আসল নামটির পরিবর্তন ঘটানোকে কোনওক্রমেই সহজভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে না। কেননা, এটা শুধু অন্যায়, নিয়ম-বহির্ভূত এবং বিভ্রান্তিকরই নয়, রীতিমত ধৃষ্টতাজনকও। কেননা, স্বয়ং বিশ্ববিধাতা যে গ্রন্থের নাম রাখলেন 'ইঞ্জিল' সে নাম পরিবর্তন করে বাইবেল বা সুসমাচার রাখাকে ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই বলা যেতে পারে না।

আমার এ কথার সমর্থনে বেশ দৃঢ়তার সাথেই বলা যেতে পারে যে, বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ত্রিপিটক, গীতা, জেন্দ-আভেস্তা প্রভৃতিও ধর্ম-গ্রন্থ। পৃথিবীর বহু ভাষাতেই এসব গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু সকলের আসল নাম ঠিকই রয়েছে বা রাখা হয়েছে— কণামাত্র পরিবর্তনও ঘটানো হয়নি। কেননা, শুধু চিরাচরিত প্রথা এবং ব্যাকরণের নিয়ম-নীতির প্রশ্নও এখানে রয়েছে। আর তা রয়েছে বলেই তাঁর দেয়া নামের পরিবর্তন ঘটিয়ে ঐসব ধর্ম গ্রন্থের কোনও ধারক এবং বাহকই তাঁর বিরাগ-ভাজন হতে বা এত বড় ধৃষ্টতা দেখাতে চান নি, বিশ্ববিধাতার দেয়া পবিত্র নাম হিসেবে হাজার হাজার বছর ধরে অতীব শ্রদ্ধার সাথে তাঁরা সেই নামটি আঁকড়ে ধরে রয়েছেন।

ভাষার পরিবর্তন

অন্যসব প্রশ্ন বাদ দিয়েও এখানে বলা যেতে পারে যে, এ নাম পরিবর্তনের সময় নাম রাখার সাধারণ নিয়ম-নীতিও নিদারুণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। নাম রাখার এ সাধারণ নিয়ম-নীতি সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বে বলেছি— নামটি

www.icsbook.info

অর্থপূর্ণ এবং নাম বস্তুর ও বস্তু নামের উপযোগী হতে হবে। তাছাড়া এমন অর্থপূর্ণ নাম রাখতে হবে যাতে নাম শোনার সাথে সাথেই শ্রোতা নামধেয় বস্তু, ব্যক্তি বা স্থানটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটা ধারণায় উপনীত হতে সক্ষম হয়।

এ সাধারণ নিয়ম-নীতি যে অতি অন্যায়ভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে 'সুসমাচার' নামটির মধ্যে আমরা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পেতে পারি। বলাবাহুল্য, সুসমাচারের অর্থ হল ভাল সমাচার বা ভাল সংবাদ। অর্থাৎ যে সমাচারের মধ্যে কু বা মন্দ সমাচার থাকতেই পারে না।

অথচ 'সুসমাচার' নামক এই গ্রন্থখানা পাঠ করলে তার মাঝে বহু 'কু' বা 'মন্দ' সমাচারও আমরা দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ যীশুখৃস্টের ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে অতীব যন্ত্রণাদায়কভাবে মৃত্যুবরণের সমাচারটি তুলে ধরা যেতে পারে। একথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ সমাচারটি শুধু খৃস্টানদের কাছেই নয়, বিশ্বের প্রত্যেক ধর্মভীরু এবং ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের কাছেই অতীব মর্মান্তিক একটি কু বা মন্দসমাচার।

তারপরে ইহুদী সম্প্রদায় কর্তৃক যীশুখৃস্টকে পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত করার যেসব সমাচার এ গ্রন্থে উল্লেখিত রয়েছে সেগুলোও যে সুসমাচার নয় নিশ্চিতরূপেই সেকথা বলা যেতে পারে।

যীশুখৃস্টের সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম 'যীহুদা' ইহুদীদের সাথে ষড়যন্ত্র করে সামান্য ত্রিশটি মাত্র রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে তাঁকে যে ইহুদীদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল এবং এ ধরিয়ে দেয়ার ফলেই যে ইহুদীরা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছিল এবম্বিধ সমাচারটিও যে সুসমাচার বলে গণ্য হতে পারে না সেকথা আমরা অনায়াসে বলতে পারি। বলাবাহুল্য, এমনি ধরনের বহুসংখ্যক কুসমাচারই তথাকথিত সুসমাচারটিতে রয়েছে। অতএব নামের সাথে বিষয়বস্তুর যে প্রচণ্ড ধরনের গরমিল বিদ্যমান সেকথা অনায়াসেই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

তাছাড়া যদি এসব কিছুকে সুসমাচার বলে ধরেও নেয়া যায় তথাপি সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। কেননা সুসমাচার শব্দটিই দ্ব্যর্থবোধক। উদহারণস্বরূপ বলা যায় যে, শুধু বাইবেলই সুসমাচারবাহী একমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ নয়। পৃথিবীতে বহুসংখ্যক ধর্মীয় গ্রন্থ রয়েছে এবং সেগুলোর মধ্যেও বহুসংখ্যক সুসমাচার রয়েছে। ধর্মীয় গ্রন্থকেই যদি সুসমাচার বলা হয় তবে ওগুলোও সুসমাচার ব্যতীত কিছু নয়।

ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও বহুসংখ্যক সু বা ভালসমাচার বক্ষে ধারণ করে ভিন্ন ধরনের বহুসংখ্যক গ্রন্থ এবং পুস্তকাদি বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায় সুসমাচার বলার

www.icsbook.info

সাথে সাথে বাইবেল বর্ণিত সুসমাচার বা বাইবেলের বাংলা সংস্করণটিকে সুনির্দিষ্টরূপে বুঝতে পারা সম্ভব নয়।

অতএব কোনও কিছুর নামকরণ করতে গিয়ে "শ্রোতা সাধারণ যাতে নামটি শ্রবণের সাথে সাথেই নামধেয় বস্তু, ব্যক্তি বা স্থানটি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণায় উপনীত হতে পারে" এ নিয়মটির কথাও যে এ নাম পরিবর্তনের সময়ে চিন্তা করা হয়নি সেকথা সুস্পষ্টরূপেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। এসব কারণে প্রকৃতপক্ষে নাম রাখার উদ্দেশ্যেই যে এখানে ব্যর্থ হয়েছে সেকথা দুঃখজনক হতে পারে কিন্তু মিথ্যা নয়।

অতীব দুঃখের সাথে এ কথাও বলতে হচ্ছে যে, স্বয়ং বিশ্বপতি 'ইঞ্জিল' নাম দিয়ে যে গ্রন্থখানা নাযিল বা অবতীর্ণ করেছিলেন, এক শ্রেণীর পাদ্রী-পুরোহিত এবং স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী শুধু যে গ্রন্থখানার নাম পালটিয়েই সন্তুষ্ট হতে পারেননি, স্বয়ং বিশ্ববিধাতার নামটিও পালটিয়ে দিয়ে তাঁরা তাঁদের খেয়াল খুশি চরিতার্থ করেছেন। বিশ্ববিধাতার নিজস্ব নাম কি, সে সম্পর্কে তিনটিমাত্র প্রমাণের উল্লেখই এখানে যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

(ক) ধর্ম-মন্দিরকে হিব্রু ভাষায় 'বয়ত-ইল' বলা হয়ে থাকে। 'বয়ত' অর্থ গৃহ এবং 'ইল' অর্থ আল্লাহ্ অর্থাৎ ইল বা আল্লাহ্‌র ঘর।

(খ) আদি পুস্তকের (৩২:১২/৩০) বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, যাকোব (প্রবঞ্চক) ঈশ্বর বা সদাপ্রভুর সাথে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছিলেন। ফলে সদাপ্রভু তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'ইসরাইল।' উল্লেখ্য হিব্রুভাষায় ইছরা অর্থ 'যুদ্ধকারী' আর ইল অর্থ আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর সাথে যুদ্ধকারী।

(গ) বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী জানা যায় যে, যীশুখৃস্টকে যখন ক্রুশে বিদ্ধ করা হয় তখন কাতরকণ্ঠে আর্তনাদ করে তিনি বলেছিলেন "এলী! এলী! লামা শিবক্তনী?" অর্থাৎ— হে আমার এলী! হে আমার এলী! কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে?[১]

বলাবাহুল্য, আসন্ন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে যে নামটি ধরে যীশুখৃস্ট তাঁর প্রভুকে ডেকেছিলেন সেটি প্রভুর আসল নাম ব্যতীত কিছু নয়। আর এই 'এলি' নামটি যে প্রভুর আসল নাম সে কথার সমর্থনে বলা যেতে পারে যে, অতি প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রভুর আসল নাম হিসেবে এল, এলোয়া, এলোহিয়া, এলোহীম, অল্ল, অল্লাহ্, আল্লা প্রভৃতি নামগুলো প্রচলিত রয়েছে।

---

১. খুব সম্ভব শব্দটি 'এলী' নয়— 'ইলী'। কেননা, ইল অর্থ প্রভু বা আল্লাহ, আর ইলী অর্থ আমার প্রভু বা আমার আল্লাহ্— লেখক।

www.icsbook.info

আর এ নামগুলো সমার্থবোধক এবং এদের মূল ধাতুও অভিন্ন। এমতাবাস্থায় বিশ্বপ্রভুর আসল নাম যে কি, সেকথা বুঝতে পারা কঠিন নয়। অথচ, সেদিকে কণামাত্রও দৃষ্টিপাত না করে উক্ত মহল নিজেদের খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করতে গিয়ে নামটির বুকে ছুরি বসাতে ত্রুটি করলেন না। অর্থাৎ ইল বা আল্লাহ্‌র নাম রাখলেন 'গড'।

অতীব দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, শুধু এ দুটি নামকে স্বেচ্ছানুযায়ী পালটিয়ে দিয়েই তাঁরা ক্ষান্ত হন নি। যাঁর মাধ্যমে ইঞ্জিল নামক পবিত্র গ্রন্থখানার অবতরণ হয়েছিল সেই ইঞ্জিলের ভাষায় তাঁর নাম হল ইসা (আ)। অথচ, সেই ইসা (আ)-এর'ই তথাকথিত ভক্তগণ তাঁর নামটিকে পালটিয়ে দিয়ে ইংরেজি ভাষায় তাঁর নাম দিয়েছেন 'জিজাস' বা 'জিসাস' আর বাংলাভাষায় 'যীশু'!

এখন বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী! নিজেরাই ভেবে দেখুন কিভাবে স্বয়ং বিশ্বপতি, তাঁর দেয়া ইঞ্জিলখানা এবং সেই ইঞ্জিলের যিনি বাহক অর্থাৎ যে তিনটি ছাড়া খৃস্টধর্মের অস্তিত্বই কল্পনা করা যেতে পারে না, সে তিনটি নামকে এমনভাবে পালটিয়ে দিয়ে খোদ খৃস্টধর্মের বুকেই ছুরিকাঘাত করা হয়েছে কি না।

আমরা মনে করি যে, প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-নীতির প্রতি এমন চরম উপেক্ষা প্রদর্শন অর্থাৎ স্বয়ং বিশ্বপ্রভুর নাম, যেনাম একমাত্র তিনি ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভবই নয় আর যেনাম পবিত্র ইঞ্জিলের মাধ্যমে স্বয়ং তিনিই ঘোষণা করেছেন, সেনামটির পরিবর্তন ঘটিয়ে যথাক্রমে ইংরেজিতে 'গড' এবং বাংলায় 'ঈশ্বর' বা 'সদাপ্রভু' রাখা, আর যে গ্রন্থখানাকে তিনি 'ইঞ্জিল' নাম দিয়ে নাযিল বা অবতীর্ণ করেছেন সেগ্রন্থখানার নাম পালটিয়ে যথাক্রমে বাইবেল ও সুসমাচার রাখা এবং সেই ধর্মের বাহক ইসা (আ)-এর নাম জিজাস এবং যীশু রাখার মত কাজকে কোনওক্রমেই দোষণীয় এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ না বলে পারা যায় না।

তবে কোনও স্বার্থের জন্যে বা অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে তাঁরা এ কাজ করেছিলেন বলে মনে করা হলে হয়তো ভুল করা হবে। খুব সম্ভব, বিষয়টিকে ভালভাবে ভেবে না দেখা আর সে সময় ভালভাবে ভেবে দেখার মতো মন-মানস এবং পরিবেশ গড়ে না ওঠার ফলেই এমনটি ঘটা সম্ভব হয়েছিল।

ভাবের পরিবর্তন

এ নাম পরিবর্তনকে হয়তো অনুবাদ বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হবে। অতএব অনুবাদের পরিণতি সম্পর্কে এখানে একটু আভাস দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।

www.icsbook.info

বলাবাহুল্য, প্রত্যেক ভাষায়ই এমন কতগুলো শব্দ থাকে যেগুলো একান্ত রূপেই সে ভাষার নিজস্ব, অন্য কোনও ভাষায় সেসব শব্দের হুবহু কোনও প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে ওসব শব্দের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য এবং তাৎপর্যও থাকে। যত চেষ্টাই করা হোক, অন্য ভাষার কোনও শব্দ দিয়ে এ বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য এবং তাৎপর্য যথাযথ ও পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় না।

অন্য ধরনের গ্রন্থ বা পুস্তক-পুস্তিকার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু ধর্মীয় গ্রন্থ যার ভাব, ভাষা, বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য, তাৎপর্য প্রভৃতি সবকিছুকে পরিপূর্ণরূপে সারাটি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে অনুবাদ পাঠ করে সে প্রয়োজন মিটতে পারে না, মিটা সম্ভবই নয়। তাছাড়া অনুবাদকে মূল বা আসল মনে করা হলে শুধু ভুল এবং অন্যায়ই করা হয় না, নানারূপ বিভ্রান্তির শিকারেও পরিণত হতে হয়। আর হতে যে হয়, এলী বা ইলী, ইঞ্জিল এবং ইসা (আ) এই নামত্রয়ের ইংরেজি এবং বাংলা অনুবাদ থেকে ইতোপূর্বে সে প্রমাণও আমরা পেয়েছি।

সংকলন-সংরক্ষণের ত্রুটি

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, ধর্ম একান্তরূপেই বিশ্বাসের বিষয় আর বিশ্বাস করা বা না করা হলো একান্তরূপেই মনের কাজ। সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, কোনও কিছু সম্পর্কে নিঃসংশয় ও নিঃসন্দিগ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন সম্ভব নয়।

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে সহৃদয় পাঠকবর্গ হয়তো একথা বেশ সুস্পষ্টরূপেই বুঝতে পেরেছেন যে, বিশ্বপ্রভু, তাঁর পবিত্র বাণী এবং সেই বাণীর যিনি বাহক অর্থাৎ যে তিনটির প্রতি সুগভীর এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি না হলে ধর্মীয় জীবন গড়ে তোলা তো দূরের কথা, তার সূচনাই সম্ভব হতে পারে না, সে তিনটি নামেরই পরিবর্তন ঘটিয়ে জনমনে এক নিদারুণ সংশয়-সন্দেহের সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এ নামের পরিবর্তন বহু পরবর্তী ঘটনা। এতদ্বারা পবিত্র গ্রন্থখানার মৌলিকতা যে ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে সে কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু অতীব দুঃখের সাথে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, প্রকৃত ঘটনা যা-ই হোক, যেসব তথ্য প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে তা থেকে একথা বলা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না যে, সূচনা থেকেই এ গ্রন্থখানার মৌলিকতা ক্ষুণ্ন করার কাজ শুরু হয়েছিল।

www.icsbook.info

কিভাবে হয়েছিল এ ক্ষুদ্র পুস্তকে তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা সম্ভব নয়। শুধু সহৃদয় পাঠকবর্গকে মোটামুটিভাবে একটা ধারণায় উপনীত হতে সাহায্য করার জন্য কয়েকটি মাত্র তথ্য নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা হল।

পূর্বেই একথা বলা হয়েছে যে, ধর্মীয় বাণীর যিনি বাহক অর্থাৎ বিশ্ববিধাতা এই বাণী প্রেরণের জন্য যাঁকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন, তিনি যদি লব্ধ বাণীসমূহ যথাযথভাবে সংকলন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করে যান তবে অন্য কারও পক্ষেই তা সম্ভব হতে পারে না। আশা করি, এই না পারার কারণ যে কি, তা বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী অবশ্যই অনুধাবন করতে পারছেন। অতএব এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে অতঃপর বলতে হচ্ছে যে, বাইবেলের বর্ণনা যদি সত্য হয় (যদিও সে সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে; আর কেন এবং কিভাবে রয়েছে, পরে সে তথ্য তুলে ধরা হবে) তবে বলতে হয় যে, অকালে এবং আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল বলে যীশুখৃস্ট কর্তৃক ইঞ্জিলের সংকলন এবং সংরক্ষণের কোন উদ্যোগই গৃহীত হতে পারেনি।

এমনকি লব্ধ-তথ্য-প্রমাণাদি থেকে একথাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁর তিরোধানের পরবর্তী অর্ধশতাধিক বছরেও তাঁর কোনও শিষ্য, অনুচর বা অন্য কোনও ব্যক্তি কর্তৃক এ উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। ফলে সূচনা থেকেই তার গোড়ায় গলদের সৃষ্টি হয়। আর এ গলদের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়াসমূহ অত্যল্পকালেই তার সারা অঙ্গে প্রকট হয়ে উঠতে থাকে।

এ প্রতিক্রিয়াসমূহের স্বরূপ কি এবং কিভাবে তার মোকাবিলা করা হয়েছিল সে কথা পরে বলা হবে। প্রথমে দেখা যাক যীশুখৃস্টের মাধ্যমে সমাগত এ ধর্মীয় বাণীসমূহ তাঁর তিরোধানের কতকাল পরে, কিভাবে এবং কার দ্বারা সংকলিত ও সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিল। আর এই ব্যবস্থার দ্বারা উক্ত গ্রন্থের মৌলিকতা ক্ষুণ্ন হয়েছিল কি না সাথে সাথে সেকথাও আমরা লক্ষ্য করে যাবো।

বাহুল্যবোধে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে মোট ছত্রিশখানা ইঞ্জিলের মধ্যে বর্তমান বাইবেলে মাত্র যে চারখানা ইঞ্জিল সন্নিবেশিত রয়েছে, তার সংকলন ও সংরক্ষণের তথ্যই অতঃপর তুলে ধরা যাচ্ছে :

০ প্রথমেই 'মথি' নামক ইঞ্জিলখানার কথা তুলে ধরতে হয়। কেননা, মথি যীশুখৃস্টের অন্যতম প্রধানশিষ্য, এবং শুধু খৃস্টান জগতেই নয়, অখৃস্টান বিশেষ করে শিক্ষিত লোকদের অনেকের কাছেই এ নামটি বিশেষভাবে পরিচিত। কথা প্রসঙ্গে 'মথিলিখিত সুসমাচার' বাক্যটির ব্যবহারও অনেকেই করে থাকেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মথি নামক ইঞ্জিলখানা যে কোন ভাষায় এবং কোন সময় রচিত হয়েছে সেকথা নির্দিষ্ট করে বলার মতো কোন প্রমাণই আমি খুঁজে

www.icsbook.info

পাইনি। কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, শত্রু কর্তৃক জেরুসালেম-এর মন্দির ভস্মীভূত হওয়ার (৭০ খৃস্টাব্দ) অব্যবহিত পূর্বে তা রচিত হয়েছিল। (মথি ২৪ অঃ ১৫ পদ দ্রষ্টব্য)। কোনও কোনও টীকাকারের মতে ৩৭ খৃস্টাব্দে, আবার কারও কারও মতে ৬৩ খৃস্টাব্দ এর রচনাকাল।

তবে ৪২—৫০ খৃস্টাব্দের মধ্যে সুরীয় ভাষায় এর 'সারকথা' এবং ৬৩—৬৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে গ্রিক বা ইউনানী ভাষায় মথি নামক এ গ্রন্থখানা রচিত হয়েছিল বলে অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য মথির জনৈক টীকাকার তাঁর টীকার ১৮ পৃষ্ঠায় এ অভিমত খণ্ডন করে বলেছেন যে, মূল ইঞ্জিলখানা যে কোন ভাষায় রচিত হয়েছিল সুনির্দিষ্টরূপে সেকথা বলার কোনও উপায় নেই।

তাছাড়া মথি যে যীশুখৃস্টের একজন শিষ্য ছিলেন সেকথা স্বীকার করে নিলেও মথি নামক ইঞ্জিলখানার লেখক যে সেই মথিই অন্তত উক্ত ইঞ্জিলের ৯ম অধ্যায়ের ৯ম পদটি নিয়ে পর্যালোচনা করলে সেকথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায় না।

বলাবাহুল্য, যে গ্রন্থখানার মৌলিকতা সম্পর্কে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টির এতসব কারণ রয়েছে তা অভ্রান্ত এবং ত্রুটিহীন, অন্য কথায় বিশ্বপ্রভুর বাণী বলে বিশ্বাস করার মতো কোনও যুক্তি আমি খুঁজে পাই নি।

০ একাজে অন্যতম উদ্যোগ গ্রহণকারী 'মার্ক' সাহেবও যীশুর শিষ্য ছিলেন না। যীশু সম্পর্কে তিনি নিজে কিছু জানতেনও না। স্বীয় জননী এবং কতিপয় ব্যক্তির কাছে যীশু সম্পর্কে যা শুনে ছিলেন তাঁর লিখিত ইঞ্জিলে অর্থাৎ 'মার্ক'-এ তিনি তাই তুলে ধরেছেন। —বাংলা টীকা ১৬১—১৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

মার্ক নামক এই ইঞ্জিলখানা কখন লিখিত হয়েছিল তার সুস্পষ্ট কোনও প্রমাণ আমি খুঁজে পাইনি। তবে কেউ কেউ অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বলেছেন, ৬৮ খৃস্টাব্দে। অর্থাৎ যীশুখৃস্টের অন্তর্ধানের ৩৫/৩৬ বছর পরে তা লিখিত হয়েছে।

মার্ক নামক এ ইঞ্জিলখানার সত্যতা এবং অভ্রান্ততা যে সন্দেহাতীত নয়, তার বহু প্রমাণ রয়েছে। বাহুল্যবোধে সেগুলো পরিত্যক্ত হল। তবু একটি কথা না বলে পারছি না যে, এর উপসংহার ভাগটি যে মার্ক সাহেবের লিখিত নয়, সেকথা আধুনিক টীকাকারগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

—বাংলা অনুবাদের টীকা ২২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য

www.icsbook.info

০ 'যোহন' নামক ইঞ্জিলখানা যে যীশুর শিষ্য হাওয়ারি যোহন (ইউহোন্না)-এরই লিখিত সেকথার বিশ্বাসযোগ্য কোনও প্রমাণও আমি খুঁজে পাই নি। যোহন নামক অন্য এক ব্যক্তি তা লিখেছেন বলেই অনেকে বিশ্বাস পোষণ করেন। তা কোন সময়ে সঙ্কলিত হয়েছে এ নিয়েও প্রচুর মতভেদ বিদ্যমান।

— বাংলা টীকা ১ম খণ্ড ৩৩৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য

অনেকে মনে করেন ৯৬ খৃস্টাব্দে তা সঙ্কলিত হয়েছে, আবার অনেকে একথা স্বীকার করেন না, (ঐ ২য় কলমের ১৮-২৫ ছত্রে দ্রষ্টব্য)। এর শেষ অর্থাৎ ২১ তম অধ্যায়টি যে যোহনের লিখিত নয়, প্রায় সকল টীকাকারই মুক্তকণ্ঠে সেকথা স্বীকার করেছেন। — ঐ, ঐ, ৩৭৬ এবং ৫৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য

আর এ ইঞ্জিলখানা আসল যোহনের দ্বারা সংকলিত হয়েছে বলে যদি ধরেও নেয়া হয় তথাপি প্রশ্ন থেকে যায় যে, এত দীর্ঘ সময় পরে কোন কোন সূত্র থেকে তিনি যীশুখৃস্টের এ বাণীসমূহ সংগ্রহ করেছিলেন অথবা নিজের স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেই তিনি এগুলো লিপিবদ্ধ করেছিলেন কিনা? নিজের স্মৃতিশক্তির প্রখরতা সম্পর্কে কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ তিনি দিয়েছেন কি না, আর যদি কোনও সূত্র থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে তবে সে সূত্রগুলোর নাম-পরিচয় কি এবং সেগুলোর নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণইবা কি?

০ এ উদ্যোগ গ্রহণকারীদের অন্যতম 'লুক' সাহেবও যীশুর শিষ্য ছিলেন না। বিশিষ্ট খৃস্টানদের কাছ থেকে যীশু সম্পর্কে যেসব কথা তিনি জানতে পেরেছিলেন সেগুলোই ৬৪ অথবা ৬৫ খৃস্টাব্দে তিনি লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। — লুক-এর টিকা ২২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য

উল্লেখ্য, যীশুর শিষ্য না হয়েও লুক সাহেবের এ উদ্যোগগ্রহণ করার কারণ কি, তিনি নিজে বিশ্বাসী লোক ছিলেন কি না, যেসব ব্যক্তির নিকট থেকে পুস্তকের প্রতিপাদ্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তাদের নাম-পরিচয়ইবা কি এবং তাঁরা কতটা বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন, এসব প্রশ্নের নির্ভরযোগ্য কোনও প্রমাণই আমি খুঁজে পাইনি। সুতরাং লুক-এর ইঞ্জিলখানা অভ্রান্ত ও অকৃত্রিম বলে বিশ্বাস করার মতো কোনও যুক্তিও আমি খুঁজে পাইনি।

ভেবে আশ্চর্যান্বিত না হয়ে পারা যায় না যে, যেখানে ধর্মীয় বাণীর সংকলন ও সংরক্ষণ বাণী-বাহকের ব্যক্তিগত উদ্যোগ অন্যথায় অন্তত তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের একান্তরূপেই অপরিহার্য, সেখানে বাণী-বাহকের তিরোধানের সুদীর্ঘকাল পর যে উদ্যোগ গৃহীত হল, সে উদ্যোগ গ্রহণকারীদের চারজনের মধ্যে দু'জনই বাণী-বাহকের শিষ্য নন! আর বাকি দু'জনও আসল কি নকল সে সম্পর্কে রয়েছে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ!

www.icsbook.info

তাছাড়া, যেখানে যীশুর বাছাই করা এবং প্রথম শ্রেণীর বলে পরিচিত মাত্র দ্বাদশ জন শিষ্যেরই একজন সামান্য ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রার লোভে যীশুকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে তাঁর প্রাণদণ্ডের সুযোগ করে দিয়েছিল, অন্যজন বিপদের সময় যীশুকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল (মথি) সেখানে বাইবেল সংকলক অন্যান্য শিষ্যদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কেইবা কি করে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যেতে পারে?

ইঞ্জিল সংকলনের সূচনাকাল থেকেই কিভাবে তার গোড়ায় গলদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল আশা করি এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই সেকথা বুঝতে পারা যাবে। আর গোড়ার এ গলদ সারা দেহে পরিব্যপ্ত হওয়ার ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই যে তার মাঝে নানা ধরনের আবিলতার সৃষ্টি তথা অদ্ভুত আলৌকিক কল্প-কাহিনী এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত বিধি-নিষেধাদির সমাবেশ সম্ভব হয়েছে আশা করি সেকথাও খুলে বলার প্রয়োজন হবে না।

দুটি স্বীকারোক্তি ও কয়েকটি অভিমত

বিজ্ঞ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমার এ কথার সমর্থন সূচক যেসব স্বীকারোক্তির বিবরণ আমার কাছে রয়েছে, তা থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দুটি মাত্রকে নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে। তাছাড়া খৃস্টানজগতের প্রখ্যাত ব্যক্তিদের অনেকেই এই আবিলতা সম্পর্কে যেসব অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং করে চলেছেন তার যেগুলো সংগ্রহ করা সেসময় আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল তার কতিপয়কেও এতদসহ তুলে ধরা হল।

০ খৃস্টানজগতের সুপ্রসিদ্ধ সাধু স্বয়ং পল সাহেব বলেছেন : "আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁর গৌরবার্থে উপচিয়ে পড়ে, তবে আমি-ই বা এখন পাপী বলে আর বিবেচিত হচ্ছি কেন? — বাইবেল (রোমীয় ৩৭)

০ পল সাহেব তো সাধু মানুষ। তাঁর কথা ছেড়ে দিয়ে খৃস্টান ধর্মের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ বিশপ (Eusebius)-এর কথায় আসা যাক। স্বয়ং বিশপ (Eusebius) সাহেবের নিজের মুখের কথায়ই শুনুন, তিনি বলেছেন : I have related whatever might be rebounded to the glory, and I have suppressed all that could tend to the disgrace of our religion. অর্থাৎ যাহা কিছু দ্বারা আমাদের ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি পাইতে পারে আমি সে সমস্ত ই বাইবেলে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছি, এবং যাহা কিছু দ্বারা আমাদের ধর্মের গৌরব হানি হইতে পারে আমি সে সমস্তকেই গোপন করিয়া ফেলিয়াছি।

— Christian Mythology unveiled— Page 66.

www.icsbook.info

মি. ব্লন্ডেল (Mr. Blondel) খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন, Whether you consider it the immoderate impudence of imposters, or the deplorable credulity of believers, it was a most miserable period and exceeded all others in pious frauds.

—Do

— প্রতারকদিগের অপরিমিত ধৃষ্টতা কিংবা বিশ্বাসীদের শোচনীয় বিশ্বাস প্রবণতা, যাহাই বিবেচনা কর না কেন, সে এক অতীত শোচনীয়কালই ছিল, এবং তখন ধার্মিকতার জুয়াচুরি অপর সকল জুয়াচুরিকে অতিক্রম করিয়াছিল।

মিঃ ক্যাসাউবন (Casauban) এ সম্পর্কে বলেন :

.... And whenever it was found the New Testament did not at all points suit the interests of its Priesthood, or the views of political rulers in league with them, necessary alterations were made, and all sorts of pious frauds and forgeries were not only common but justified by many of the fathers. —Do

—এবং যখনই দেখা যাইত যে, নূতন নিয়ম বাইবেল, তাহার পুরোহিতদিগের স্বার্থের কিংবা তাহাদের দলের রাজনৈতিক শাসনকর্তৃগণের উদ্দেশ্যের অনুকূল হইতেছে না, তখনই তাঁহাদের আবশ্যক মত পরিবর্তন করিয়া দেওয়া এবং শুধু যে সকল প্রকার সাধুতার জুয়াচুরি কিংবা জালিয়াতি করাই সাধারণ হইয়া পড়িয়াছিল তাহা নহে বরং অনেক পুরোহিত কর্তৃক তাহা ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া প্রমাণও করা হইয়াছিল।

এ সম্পর্কে আর একটিমাত্র মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে গমন করছি। মন্তব্যটি হল : John William Burgon B. D. এর।

তিনি তাঁর 'The causes of the corruption of the Tradtional Text of the Holy Gospels' (এডওয়ার্ড মিলার এম, এ, কর্তৃক সম্পাদিত, লন্ডন, ১৮৯৬, ২১১ পৃঃ) নামক পুস্তকে বাইবেলের এই বিকৃতি ঘটানোর বহু কারণের উল্লেখ করার পরে 'বিশ্বাসীদিগের ইচ্ছাপূর্বক বিকৃত' শীর্ষক অধ্যায়ের ভূমিকায় লিখেছেন, These persons ..... evidently did not think it at all wrong to temper with the inspired Text, if any expression seemed to (them to have a dangerous tendency, they altered it, or) transplanted it, or removed it bodily from the sacred page. About the immorality of the proceeding, they evidently did not trouble them at all. On the contrary the piety of the

www.icsbook.info

motives seems selves to have been held to constitute a sufficient excuse for any amount of license.

— "এই সকল লোক যে ধর্ম পুস্তকগুলোকে বিকৃত করা আদৌ কোনও দোষের কাজ বলিয়া মনে করিতেন না, তাহা স্পষ্টত জানা যাইতেছে। ঐ সকল পুস্তকের কোনও উক্তি তাঁহাদের পক্ষে মারাত্মক বলিয়া বিবেচিত হইলে তাঁহারা তাহা বদলাইয়া দিতেন, তাহা স্থানান্তরিত করিয়া অথবা সম্পূর্ণ পদটি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে একেবারে অপসারিত করিয়া ফেলিতেন। .... ইহা যে নীতি বিগর্হিত অসৎ কার্য তাহা চিন্তা করার কষ্ট তাঁহারা আদৌ স্বীকার করিতেন না। বরং পক্ষান্তরে সাধু উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ঐরূপ করা হইতেছে, এই খেয়ালকেই তাঁহারা নিজেদের কার্যের সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।"

সংকলন ও সংরক্ষণের ত্রুটি কিভাবে ইঞ্জিলের ভিত্তি বা মৌলিকতাকে ক্ষুণ্ন করেছে এবং কত বেশি পরিমাণে করেছে আশা করি ওপরের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই তা বুঝতে পারা যাবে। তারপর এই দুর্বল ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা গ্রন্থখানার মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ে কিভাবে এবং কত বেশি পরিমাণে গলদের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে সে সম্পর্কীয় স্বীকারোক্তি এবং অভিমতের সংখ্যা আর না বাড়ালেও বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর কাছে তা বুঝতে পারা কঠিন হবে না বলেই আমি মনে করি।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, বিশ্বপ্রভুর দেয়া বিধানটিকে এভাবে এক শ্রেণীর মানুষ কর্তৃক কুক্ষীগত করে নেয়া এবং তাঁদের বিচার-বিবেচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত করার স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে এর গোটা দেহটাই এক সময় গলদে গলদে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং প্রাণশক্তি ভীষণভাবে আচ্ছন্ন ও আড়ষ্ট করে ফেলে।

প্রতিক্রিয়া

ধর্মীয় বিধানের এই নিদারুণ অবস্থা যে তদানীন্তন কালের চিন্তাশীল মহলকে ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল করে তুলেছিল সেকথা সহজেই অনুমেয়। আর এ অচল অবস্থার অবসানের জন্য তাঁরা যে বিশেষভাবে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন এবং তা-ই যে স্বাভাবিক সেকথা বুঝতে পারাও কঠিন নয়।

কিন্তু চঞ্চল এবং তৎপর হয়ে উঠলেও কাজটি ছিল যেমন কঠিন, তেমনই স্পর্শকাতর। অতএব সন্তর্পণে এবং সুকৌশলে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তদানীন্তন অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে ইঞ্জিলের মধ্যে নানা

www.icsbook.info

ধরনের অদ্ভুত-অলৌকিক কল্পকাহিনী এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত ও যুক্তিবিরোধী বিষয়াদির সমাবেশকে অন্যায় হলেও অপ্রত্যাশিত বলে আমি মনে করতে পারিনি। কেন পারিনি এবং ধর্মগ্রন্থখানাকে আবিলতা-মুক্ত করার কাজটিকে কেন কঠিন ও স্পর্শ-কাতর বলা হল সে সম্পর্কে দুটি কথা বলার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি। অন্যথায় বিষয়টি সম্যকভাবে উপলব্ধি করা অন্তত সাধারণ পাঠকদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না বলেই আমার বিশ্বাস। অতএব সে সম্পর্কে দুটি কথা বলে তার পরে আমার মূল বক্তব্য শুরু করাই যুক্তিযুক্ত হবে।

মানব-শিশু ও শিশু-মানব

ক্রম-বিকাশের স্বাভাবিক ধারা বা মানব সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে যাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁরা অবশ্যই একথা জানেন যে, ব্যক্তিজীবনের মতো জাতীয়জীবনেও মানবজাতিকে শৈশব, বাল্য, কৈশোর প্রভৃতি পর্যায়গুলো একে একে অতিক্রম করে বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হতে হয়েছে।

একদিন গুহাজীবন থেকে যাত্রা শুরু করে আজ মহাশূন্যে পাড়ি জমানোর মধ্যেও এ ক্রম-বিকাশের সুস্পষ্ট লক্ষণই আমরা দেখতে পাই।

মানবজাতির সেই শৈশবকালে তার মন-মানস যখন শিশুসুলভ জড়তায় আড়ষ্ট ও আচ্ছন্ন ছিল, তখন অদ্ভুত-অলৌকিক কোনও কিছু দেখলেই সে বিস্মিত অভিভূত হয়েছে, তার আড়ষ্ট-আচ্ছন্ন এবং অপরিণত মন-মানস দিয়ে সে সম্পর্কে একটা কিছু কল্পনা করে নিয়েছে।

এমনি ভাবেই কোনও এক পর্যায়ে উপনীত হয়ে যাকিছু তার কাছে অদ্ভুত-অলৌকিক বিবেচিত হয়েছে তার প্রতিই সে ঐশ্বরিক শক্তির আরোপ করেছে। অনুরূপভাবে যার কার্যকলাপে কিছুমাত্র অলৌকিকত্ব বা অসাধারণত্ব লক্ষ্য করেছে তাকেই স্বয়ং ঈশ্বর, ঈশ্বরের অংশ, ঈশ্বরের অবতার, ঈশ্বরের সন্তান প্রভৃতি বলে ধারণা করে নিয়েছে। যতদূর জানা যায়, এ পর্যায়েই এমন একটা ধারণা তার মন-মানসে বদ্ধমূল হয়ে পড়ে যে, "অদ্ভুত, অলৌকিক যা নয়, তা ধর্ম হতে পারে না।"

অর্থাৎ ধর্ম বলতেই এমন সব বিষয়বস্তু এবং কার্যকলাপ বোঝায় যা অদ্ভুত, অলৌকিক, হেঁয়ালিপূর্ণ, দুর্বোধ্য এবং মানবীয় ধ্যান-ধারণার অতীত। বলাবাহুল্য, এ মানসিকতা থেকেই তারা একথাও ধারণা করে নিয়েছিল যে, যে মানুষের কার্যকলাপ যত বেশি অদ্ভুত-অসাধারণ এবং যত বেশি হেঁয়ালিপূর্ণ সে

www.icsbook.info

মানুষ তত বড় মহাপুরুষ বা ঈশ্বরের তত বেশি অংশ তার মাঝে বিরাজমান রয়েছে। পক্ষান্তরে যাদের কার্যকলাপের মধ্যে এসবের অভাব রয়েছে মহাপুরুষ বলে বিবেচিত হওয়ার কোনও যোগ্যতাই তাঁদের নেই।

যতদূর জানা যায়, এ সময়ে ধর্মীয় নেতা বা যাজক-সম্প্রদায়ের মনে এ ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে পড়েছিল যে, সাধারণ মানুষদের পক্ষে কোনও কিছু, বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা একান্তরূপেই ঈশ্বরের ইচ্ছা-বিরোধী; সুতরাং জঘন্য ধরনের পাপজনক এবং সর্বোতভাবে পরিত্যাজ্য।

এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। অতএব এ প্রসঙ্গের উপসংহার টেনে বলতে হচ্ছে যে, সুদূরের সেই অতীতে ধর্ম এবং ধর্মগুরু সম্পর্কে শিশু-মানবদের মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হয়ে পড়া এসব ধারণা-বিশ্বাস উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের বংশধরদের মধ্যবর্তিতায় চলে এসেছে।

যীশুখৃস্টের সময়ে অর্থাৎ আজ থেকে দু'হাজার বছর পূর্বের মানুষ, বিশেষ করে যাজকসম্প্রদায় অর্থাৎ ধর্মীয় বিধান যারা নিজেদের কুক্ষীগত করে নিয়েছিলেন এবং ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানাদির পরিচালনা ও বিধি-ব্যবস্থা প্রদান ও প্রণয়নে যাদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের মন-মস্তিষ্ক অতীতের এ সব ধারণা বিশ্বাস থেকে মুক্ত ছিল না।

আর যেহেতু এক শ্রেণীর যাজক বা পাদ্রী পুরোহিত সাধারণ মানুষদের মধ্যে এই ইঞ্জিলকেই আদি, অকৃত্রিম, অভ্রান্ত এবং ঈশ্বরের মুখ-নিসৃত বাণী বলে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন অতএব ইঞ্জিলকে অবিলতামুক্ত করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের পক্ষে একাজ শুধু কঠিনই নয়— বিশেষভাবে স্পর্শকাতর কাজ বলেও আমি মনে করেছিলাম। আমার এই মনে করা যথার্থ ছিল কিনা আশা করি বিজ্ঞ পাঠকবর্গ সেকথা ভালভাবে ভেবে দেখবেন।

প্রতিকারের প্রচেষ্টা

সংস্কারকামী ব্যক্তিদের পক্ষে সেদিন একাজ কত কঠিন ছিল সেকথা ভেবে দেখার জন্যে ইতিহাসের যাঁরা পাঠক তাদের মনকে একটিমাত্র ঘটনার প্রতি নিবদ্ধ করাই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

ঘটনাটি ঘটেছিল এই ঘটনার প্রায় হাজার বছর পরে। অর্থাৎ তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল; মুসলমানদের সংস্পর্শে আসার ফলে অন্ধকার ইউরোপেও যেদিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো জ্বলে উঠেছে। কিছুসংখ্যক মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু করেছেন, ঠিক এমনি সময়ে পাদ্রী-

www.icsbook.info

পুরোহিতদের পক্ষ হতে এই অজুহাতে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, সাধারণ মানুষদের পক্ষে স্বাধীনভাবে কোনও কিছু চিন্তা করা একান্তরূপেই ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী কাজ। সুতরাং ধর্মের যারা গুরু, তাদের পক্ষে এই অন্যায় অসঙ্গত এবং ধর্মবিরোধী কাজকে কোনওক্রমেই চলতে দেয়া সম্ভব নয়।

ইতিহাসের পাঠকমাত্রেরই জানা রয়েছে যে, এ বাধার ফলে অনেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন আর যারা তা করেননি তাদেরকে পাদ্রী-পুরোহিতদিগের দ্বারা শুধু ভীষণভাবে লাঞ্ছিতই হতে হয়েছিল না, অনেককে প্রাণও হারাতে হয়েছিল। অতএব এ ঘটনার এক হাজার বছর পূর্বে ইঞ্জিলের ভুল-ত্রুটি নিয়ে চিন্তা করা বা তার সংস্কার সাধনের কাজ যে কত বড় কঠিন এবং বিপজ্জনক ছিল সেকথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

সাপও মরে আবার লাঠিও না ভাঙ্গে

এবারে আমাদের মূল বক্তব্যে ফিরে গিয়ে বলতে হচ্ছে যে, এই অবস্থার জন্য সংস্কার-কামীদের বাধ্য হয়েই "সাপও মরে আবার লাঠিও না ভাঙ্গে" অর্থাৎ পশ্চাৎপন্থী এবং রক্ষণশীল পাদ্রী-পুরোহিত ও অজ্ঞ জনসাধারণ যাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে না উঠে, আবার কাজটিও সম্পন্ন হয় এমন একটি পথ বেছে নিতে হয়েছিল। এই উভয় কূল বজায় রাখার জন্য কাজটি যে তারা একটি 'দৈবঘটিত' কাজ বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন এবং তাতে এক দিক দিয়ে সফলও হয়েছিলেন নিম্নবর্ণিত ঘটনা থেকে তা জানতে পারা যাবে।

প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, ইসা (আ) বা যীশুখৃস্টের মাধ্যমে অবতীর্ণ বাণীসমূহের সংখ্যা কত ছিল এবং সেগুলোকে গ্রন্থকারে সংকলন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা তিনি করে গেছেন কি না সেকথা বলা আজ আর সম্ভব নয়। তবে এই বাণীসমূহকে যে সামগ্রীকভাবে ইঞ্জিল নামে অভিহিত করা হয় নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সেকথা জানতে পারা যায়।

যীশুখৃস্টের তিরোধাণের পর কতিপয় ব্যক্তি যে ভিন্ন ভিন্নভাবে এই বাণীসমূহ সংকলিত করার ব্যবস্থা গ্রহণকারীদের সংখ্যা কত এবং ভিন্ন ভিন্নভাবে তাদের সংকলিত ইঞ্জিল এবং গ্রন্থাদির সংখ্যাই বা কত সেকথা সুনির্দিষ্টরূপে বলার কোনও উপায় নেই।

তবে *Encyclopeadia Britanica, Art Aphocryphal literature* শীর্ষক সন্দর্ভে ইঞ্জিলের যে বিবরণ দেয়া হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, ইঞ্জিলের মোট সংখ্যা ৩৬;'প্রেরিতদিগের কার্য' ও 'শেষে প্রেরিত যোহনের প্রকাশিত

www.icsbook.info

বাক্য' নামে দু'খানা পুস্তক এবং 'প্রেরিতদিগের পত্র' আখ্যাত পত্রের সংখ্যা ১১৩। উল্লেখ্য, এই সমষ্টিই নতুন নিয়ম বা New Testament বলে পরিচিত।

কিন্তু বর্তমানে বাইবেল মথি, মার্ক, লুক ও যোহনের নামে মাত্র ৪ খানা ইঞ্জিল ও ওপরোক্ত দু'খানা পুস্তকসহ সর্বমোট ছ'খানা পুস্তক এবং ১১৩ খানার মধ্যে মাত্র ২১ খানা পত্র বিদ্যমান রয়েছে। নিদারুণভাবে এই সংখ্যা হ্রাসের কারণ কি, সে সম্পর্কে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে। এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে ওপরোক্ত সংস্কারকামীদের সংস্কারমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

পূর্বেই বলেছি, তাঁরা তাঁদের এই সংস্কারের কাজটিকে 'দৈবঘটিত' কাজ বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন এবং এক হিসেবে কৃতকার্যও হয়েছিলেন। কিভাবে হয়েছিলেন অতঃপর সে কথাই বলা হচ্ছে।

শেষ পরিণতি

৩২৫ খৃস্টাব্দে নিকিও কাউন্সিলের এক অধিবেশন আহ্বান করা হয়।[১] উক্ত অধিবেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে ঠিক হয় যে, ইঞ্জিলের পত্রগুলোকে এলোমেলোভাবে বেদীর ওপর ফেলে দেয়া হবে, তাঁর মধ্যে যেগুলো বেদীর ওপর টিকে থাকবে সেগুলোকে গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নেয়া হবে, আর যেগুলো বেদীর বাইরে পড়ে যাবে সেগুলো জাল এবং মিথ্যা বলে পরিত্যক্ত হবে।

এই ব্যবস্থানুযায়ী ওপরোক্ত ৩৬ খানা ইঞ্জিল, দু'খানা পুস্তক এবং ১১৩ খানা পত্রকে বেদীর ওপর এলোমেলোভাবে ফেলে দেয়া হলে মাত্র ৪ খানা ইঞ্জিল, ২ খানা পুস্তক এবং ২১ খানা পত্র বেদীর ওপর টিকে থাকে এবং গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। বিখ্যাত পোপ গ্লাসিওস (৪৯২—৪৯৬ খৃস্টাব্দ)এর সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে সনদ প্রদান করেন। বলাবাহুল্য, এই নব বা অভিনব সংস্করণই প্রকৃত বা খাঁটি ঐশীবাণীরূপে সংস্কারকামী বা প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে চালু হয়ে যায়। কি কারণে এরা প্রোটেস্টান্ট বলে পরিচিত হলেন অতঃপর সে সম্পর্কে দুটি কথা বলা প্রয়োজন।

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, পশ্চাৎপন্থী এবং রক্ষণশীল পাদ্রী-পুরোহিতরা এই গলদে পরিপূর্ণ ইঞ্জিলকেই সাধারণের মধ্যে আদি, অকৃত্রিম এবং ঈশ্বরের মুখ-নিসৃত বাণী বলে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

---

১. (Voltaire) Quted by Sir Syed, 6th Essay, 23—24.

www.icsbook.info

উল্লেখ্য, প্রাচীনপন্থী খৃস্টানরা 'রোমান ক্যাথলিক' বলে পরিচিত। আর যারা প্রাচীনপন্থীদের এ কাজের প্রোটেস্ট বা প্রতিবাদ করে ইঞ্জিলের সংস্কার সাধন করেছিলেন তাঁরা প্রোটেস্টান্ট বা প্রতিবাদকারী। অন্য কথায় বিরোধী সম্প্রদায় বলে পরিচিত হয়েছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি মনে করি যে, রোমান ক্যাথলিক বা প্রাচীনপন্থীরা ভুল বুঝে অতীত গলদের বোঝা বয়ে চলেছেন আর প্রোটেস্টান্টরাও সেই গলদের বোঝাই বয়ে চলেছেন, তবে ভুল বুঝে নয়, ভুল করে। তাঁরা কি ভুল করেছেন এবং কিভাবে করেছেন (অবশ্য আমার বিবেচনায়) তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। শুধু সংক্ষেপে এটুকুই বলা যাচ্ছে :

ওপরোক্ত ব্যবস্থার দ্বারা সুদীর্ঘ ৩২৫ বছর ধরে ঈশ্বরের মুখ-নিসৃত বাণী বলে গৃহীত ও প্রচলিত ৩০ খানা ইঞ্জিল এবং ৯২ খানা পত্র মিথ্যা ও জাল বলে বাদ দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল একথা সত্য; কিন্তু যে ৪ খানা ইঞ্জিল এবং 'প্রেরিতদের কার্য' শীর্ষক একখানা ও 'শেষে প্রেরিত যোহনের প্রকাশিত বাক্য' শীর্ষক একখানা এই দু'খানা পুস্তক এবং ২১ খানা পত্র আসল ও খাঁটি বলে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যেও গলদের অন্ত ছিল না। আর এ ব্যবস্থার দ্বারা সেগুলোকে গলদমুক্ত করাও সম্ভব ছিল না।

অবশ্য এ ব্যবস্থার দ্বারা তাঁদের বোঝা যে কিছুটা হালকা হয়েছিল, সেকথা অস্বীকার করা যায় না। তবে বোঝা হালকা হলেও তার প্রায় সবটাই ছিল গলদে পরিপূর্ণ।

সুখের বিষয়, এই হালকা বোঝার মধ্যেও তাঁরা যে গলদের বোঝাই বয়ে চলেছেন এ কথাটা তাঁরা না হলেও তাঁদের পরবর্তী সময়ের অপেক্ষাকৃত উন্নত ও চিন্তাশীল মানুষেরা বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন এবং এ গলদ দূরীকরণের যথাযোগ্য পদক্ষেপও তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। কি পদক্ষেপ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন অতঃপর সে কথাই বলা হবে।

ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, চিন্তাশীল এবং সংস্কারকামী খৃস্টান পণ্ডিতমণ্ডলী ১৮৭০ খৃস্টাব্দে ইংলন্ডের ক্যান্টনবেরি নগরে এই উদ্দেশ্যে এক সভায় মিলিত হন এবং অভিমত প্রকাশ করেন যে, ১৬১১ খৃস্টাব্দে (প্রথম জেমস্-এর সময়ে) বাইবেল নাম দিয়ে ইঞ্জিলের যে ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছিল, তার সংশোধন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। কারণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও নানাবিধ আবিষ্কার উদ্ভাবনের ফলে পুরাতন বাইবেল নিয়ে আর চলা যেতে পারে না।

www.icsbook.info

অতএব প্রয়োজনীয় সংস্কার-সংশোধন করে বাইবেলকে আধুনিক বা চলনোপযোগী করে তোলার জন্য উক্ত সভার পক্ষ হতে ২৭ জন পণ্ডিত ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে চেষ্টা সাধনা করার পরে ১৮৮২ সালে বাইবেলের যে নতুন সংস্করণ বের করেন, তা-ই বর্তমান Revised Version বলে পরিচিত। এই কমিটি বাইবেলের যে বিষয়গুলোকে এক বাক্যে মিথ্যা ও জাল বলে নির্ধারণ করেন মোটামুটিভাবে সেগুলো হল :

(ক) মৃত্যুর পরে যীশুর পুনর্জ্জীবিত হওয়া, শিষ্যদের সাথে সাক্ষাৎ এবং সশরীরে স্বর্গারোহণ ও স্বর্গস্থ পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে আসনগ্রহণ।

— মথি ৬-২৩ এবং মার্ক ১৬-৯-২৩ পদ

(খ) স্বর্গীয় দূত কর্তৃক 'বৈযেসদা' পুস্করিণীর জল-কম্পন।

— যোহন ৫ : ৩-৪ পদ

(গ) ব্যভিচারিনী নারীর বিনাদণ্ডে মুক্তি লাভ। — যোহন ৮-১১

(ঘ) যীশুখৃস্ট ঈশ্বরের 'পুত্র'-এই বিশ্বাস। — প্রেরিত ৮-৩০

(ঙ) ত্রিত্ববাদ। — যোহনের ১ম পত্র, ৫-৭

উল্লেখ্য, এই Revised Version-ই বর্তমানে খৃস্টানদের প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের পবিত্র ধর্মগ্রন্থরূপে গীর্জার চার দেয়ালের মধ্যে শ্রদ্ধার বস্তু হিসেবে বিরাজমান রয়েছে। কেননা গীর্জার বাইরে তার কোনও কাজ নেই, কদরও নেই। আর এই কাজ এবং কদর না থাকার কারণ হল, এত কিছু করার পরও তার মাঝে যথেষ্ট পরিমাণে গলদ রয়ে গেছে, যা থেকে তাকে মুক্ত করতে গেলে তার অস্তিত্বই টিকিয়ে রাখা আর সম্ভব হয়ে উঠবে না।

বলাবাহুল্য, যার গোড়া থেকে শুরু করে সারাটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এমন গলদের ছড়াছড়ি তাকে গলদমুক্ত করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। আর পারে না বলেই খৃস্ট-সমাজকে বাধ্য হয়ে তাদের জীবনের সকল পর্যায় এবং সকল ক্ষেত্র থেকে ধর্ম বাদ-দিয়ে নিজদের 'ধর্ম নিরপেক্ষ' হতে হয়েছে।

দুঃখের বিষয়, ধর্মনিরপেক্ষতার এই রক্ষাকবচ ধারণ করেও নানা কারণে তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। ফলে শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে তাদের ঘোষণা করতে হয়েছে, 'ধর্ম একান্তরূপেই ব্যক্তিগত ব্যাপার।' সুতরাং তা মানা বা না মানা সেটা একান্তরূপেই নির্ভর করে ব্যক্তির ইচ্ছা বা অনিচ্ছার ওপর। অর্থাৎ যাঁর ইচ্ছা সে আনুষ্ঠানিকভাবে সাতদিন পর একবার গীর্জায় গিয়ে হাজিরা দিয়ে আসবেন আর যাঁর ইচ্ছা হবে না তিনি সারাজীবনে একবারও যদি গীর্জায় না যান তবে সে জন্যে তাঁকে কারো কাছে কোনও কৈফিয়তই দিতে হবে না।

www.icsbook.info

বলাবাহুল্য, প্রকারান্তরে জীবনের সাথে ধর্মের পাঠ চুকিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যেই এটা করা হয়েছে। আর করা হয়েছে একান্ত বাধ্য হয়েই। অর্থাৎ অচল ও বিকলাঙ্গ এই ধর্মগ্রন্থ নিয়ে চলা সম্ভব নয় বলেই।

আমার এই কথার সমর্থনে বর্তমান New Testament-এর মোটামুটি একটা পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হচ্ছে। তবে পূর্বোক্ত Aphocryphal literature নামক সন্দর্ভে যে ৩৬ খানা ইঞ্জিল ও ১১৩ খানা পত্রের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে এবং রোমান ক্যাথলিক খৃস্টানরা যেগুলোকে আসল ও অকৃত্রিম বলে মনে করেন স্থানাভাব বশত সেগুলোর নাম এবং পরিচয় এখানে তুলে ধরা সম্ভব হলো না।

প্রোটেস্টান্ট খৃস্টানরা অর্থাৎ যাদের সংস্কারকামী বলে আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি তাঁরা ৩২৫[১] ও ১৮৭০ খৃস্টাব্দে মিথ্যা, জাল ও যুগের অনুপযোগী বলে বাদ দিয়ে ওসবের মধ্য হতে যে কতিপয়কে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানের New Testament (Revised Version) গড়ে তুলেছেন অগত্যা শুধু সে কয়টির নাম এবং পরিচয়ই এখানে তুলে ধরতে হলো। প্রথমে ইংরেজি ভাষায় এবং পরে বন্ধনীর মধ্যে বাংলাভাষায় সেগুলোর নাম তুলে ধরা যাচ্ছে :

১। Matthew (মথি লিখিত সুসমাচার) ২। Mark (মার্ক ঐ) ৩। Luke (লুক্ ঐ) ৪। John (যোহন ঐ) এই চারখানা ইঞ্জিল।

৫। The Acts (প্রেরিতদের কার্যাবলী) ৬। Revelation (শেষে প্রেরিত যোহনের প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য) এই দু'খানা মিলে মোট ছ'খানা পুস্তক।

১। Epistle to the Romans (রোমীয়দের প্রতি পৌলের পত্র) ২। Corinthians (১ম করিন্থীয় ঐ) ৩। Corinthians (২য় করিন্থীয় ঐ) ৪। Calations (গালাতীয় ঐ) ৫। Ephesians (ইফিসীয় ঐ) ৬। Philippians (ফিলিপীয় ঐ) ৭। Calossians (কলসীয় ঐ) ৮। Thessalonians (১ম থিযলনিকীয় ঐ)। ৯। 2 Thessalonians (২য় থিযলনিকীয় ঐ) ১০। Timothy (১ম তিমথীয় ঐ) ১১। 2 Timothy (২য় তিমথীয়) ১২। Titus (তিতের প্রতি ঐ) ১৩। Philemon ফিলিমনের প্রতি ঐ) ১৪। To the

---

১. ঘটনার বিবরণে প্রকাশ : পশ্চাৎপন্থী ও রক্ষণশীল পাদ্রী-পুরোহিত এবং তাঁদের সমর্থকদের তীব্র বিরোধিতার মুখে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের জন্য সংস্কারকামীদের এ সময় বাধ্য হয়ে মরা মানুষদের ভোটও নিতে হয়েছিল।

বলাবাহুল্য, এ বেলায়ও কাজটিকে 'দৈবঘটিত' কাজ বলে রূপ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ— ইঞ্জিল এবং পত্রের মুশাবিদাগুলো ওপর থেকে এলোমেলোভাবে মৃত ব্যক্তির কবরের ওপর ফেলে দেয়া হয়, এই অবস্থায় যেগুলো কবরের বাইরে পড়ে যায় সেগুলোর প্রতি মৃত ব্যক্তির সমর্থন নেই বলে ধরে নেয়া হয়। — Christian Mythology unveiled দ্রষ্টব্য

www.icsbook.info

Hebrews (ইব্রিয়দের প্রতি ঐ) ১৫। Epistle of James (যাকোবের সাধারণ পত্র) ১৬। Peter (১ম পিতরের সাধারণ পত্র) ১৭। 2 Peter (২য় পিতরের ঐ) ১৮। John (১ম যোহনের সাধারণ পত্র) ১৯। 2 John (২য় যোহনের ঐ) ২০। 3 John (৩য় যোহনের ঐ) ২১। Jude (যিহুদার সাধারণ পত্র)। বিভিন্ন মণ্ডলীর নিকটে লিখিত এই ২১ খানা পত্র।

বলাবাহুল্য, এটাই ১৮৮২ খৃস্টাব্দে ক্যান্টনবেরি কমিটি কর্তৃক ছাটাই-বাছাইকৃত বাইবেলের নতুন সংস্করণ বা **revised version** যা সেই থেকে প্রোটেস্টান্ট খৃস্টানদের মাঝে ভেজালমুক্ত বাইবেল বা নির্ভেজাল সুসমাচার রূপে চালু রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই কতগুলো প্রশ্ন মনকে ভীষণভাবে দোলা দেয়। স্থানাভাববশত তার সবগুলোর উল্লেখ এখানে সম্ভব নয় বলে কয়েকটিকে নিম্নে তুলে ধরা হল :

(ক) ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, ওপরোক্ত চারখানা ইঞ্জিলের সাথে যে চার ব্যক্তির নাম জড়িত রয়েছে তাদের দু'জন যীশুর শিষ্য ছিলেন না এবং বাকি দু'জনও একই নামের ভিন্ন ব্যক্তি কি-না তা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে, তাছাড়া তাঁদের সংগ্রহ এবং সংকলনের সূত্রও সন্দেহমুক্ত নয়। এমতাবস্থায় এগুলোকে নির্ভেজাল বলে মনে করা সম্ভব কি না?

(খ) যে পদ্ধতিতে (অর্থাৎ এলোমেলোভাবে বেদীর ওপর ফেলে দিয়ে এবং মরা মানুষের ভোট নিয়ে) এ ইঞ্জিল চতুষ্টয়কে নির্ভুল নির্ভেজাল বলে অন্য ৩৬ খানা হতে পৃথক করা হয়েছিল তা সমর্থনযোগ্য তথা ভেজালমুক্ত করার নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি ছিল কি না?

(গ) ওপরোক্ত চারখানা ইঞ্জিল ছাড়া যে দু'খানা পুস্তক ও ২১ খানা পত্র সত্য ও অভ্রান্ত বলে বর্তমান New Testaments (Revised Version) এ বিদ্যমান রয়েছে, নিশ্চিতরূপেই ওগুলো ইঞ্জিলের অংশ বা যীশুর প্রতি অবতীর্ণ প্রত্যাদেশে নয়, যীশুখৃস্টের শিষ্য, প্রশিষ্য এবং অশিষ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর খৃস্টধর্ম প্রচারসম্পর্কীয় কার্যাবলীর বর্ণনা বা সেই উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রাবলী। এমতাবস্থায় ওগুলোকে পবিত্র ইঞ্জিলের অঙ্গীভূতকরণ ও ইঞ্জিলের সাথে সমমর্যাদা দান শোভন ও সঙ্গত হয়েছে কি না? আর এ কাজের দ্বারা ইঞ্জিলের পবিত্রতা এবং নির্ভরযোগ্যতা ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে কি না?

(ঘ) খৃস্টজগতের যাবতীয় পাপরাশির প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে যীশুর প্রাণ দান, মৃত্যুর পরে পুনর্জীবিত হয়ে সশরীরে স্বর্গে আরোহণ এবং স্বর্গীয়

www.icsbook.info

পিতার সিংহাসনে তারই ডান পাশে আসনগ্রহণ প্রভৃতি ঘটনাসমূহের বর্ণনা আজও New Testament (Revised Version) এ বিদ্যমান রয়েছে।

—মার্ক ১৬ অ: ১৯ পদ লুক ২৪—৫০

এ সব ঘটনা অলীক অবিশ্বাস্য এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কি না সুধী পাঠকবর্গই সে কথা ভেবে দেখুন এবং ভেবে দেখুন যে এগুলো যদি অলীক-অবিশ্বাস্য এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত হয় তবে উক্ত গ্রন্থখানাকে ভেজালমুক্ত বলে দাবি করা হলেও আসলে তা ভেজালমুক্ত হয়েছে কি না?

(ঙ) যেহেতু ইঞ্জিলের বাণীসমূহ অবতারণের জন্য বিশ্বপ্রভু একমাত্র যীশু-খৃস্টকেই মাধ্যম হিসেবে মনোনীত করেছিলেন, সেহেতু মৃত্যুর পরে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার কোনও সুযোগই থাকে না এবং যেহেতু মৃত্যুর পর যীশুখৃস্ট এই পৃথিবী ছেড়ে সুদূরের সেই স্বর্গীয় পিতার আসনে গিয়ে বসেছিলেন অতএব New Testament-এ বিদ্যমান ওপরোক্ত ঘটনাসমূহকে যদি সত্য বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে সাথে সাথে একথাও স্বীকার করে নিতে হয় যে, মৃত্যুর পরেও যীশুখৃস্টের প্রতি ইঞ্জিলের অবতারণ বন্ধ হয়নি এবং তিনি অতি সংগোপনে স্বর্গীয় পিতার সিংহাসন থেকে নেমে এসে পৃথিবীতে বিদ্যমান ইঞ্জিলের মধ্যে তাঁর মৃত্যুর পর সংঘটিত ওপরোক্ত ঘটনাগুলো লিখে রেখে গেছেন। পক্ষান্তরে এগুলো যদি ভক্ত-ভাবুকদের কল্পনাপ্রসূত হয় আর সত্য বলে স্থান পেয়ে থাকে (আসলে হয়েছেও তা-ই) তবে এবারেও সুধী পাঠকবর্গ নিজেরাই ভেবে দেখুন ছাটাই-বাছাই করতে করতে মূলগ্রন্থের ছ'ভাগের পাঁচ ভাগ বাদ দেয়া এবং তার পরও দীর্ঘদিন ছাটাই-বাছাই অব্যাহত রাখার ফলে গ্রন্থখানা গলদমুক্ত হয়েছে কি না?

যেহেতু যীশুখৃস্টের মৃত্যু বা তিরোধানের সাথে সাথেই প্রত্যাদেশ অর্থাৎ ইঞ্জিলের অবতারণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর তা-ই স্বাভাবিক; এমতাবস্থায় যীশু-খৃস্টের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে সংঘটিত বলে কথিত এসব ঘটনা কি করে বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত হলো এ নিয়ে পাঠকবর্গের মনে একটা প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। অতএব বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে এ সম্পর্কে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তা' নিম্নে তুলে ধরা হল :

যীশুকে হত্যা করে হত্যাকারীরা তাদের এ কাজকে বৈধ এবং ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণ করার অভিপ্রায়ে তারা যীশুকে 'জারজ', 'রাষ্ট্রদ্রোহী', 'ভণ্ড', 'অভিশপ্ত' প্রভৃতিরূপে জনমনে একটা ধারণা সৃষ্টির জন্যে জোর প্রচারণা চালাতে শুরু করে।[১]

---

১. বাইবেল নিয়ে একটু পর্যালোচনা করা হলেও এ সত্যই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে; বহু খৃস্টান মনীষীও পুস্তক পুস্তিকার মাধ্যমে এই সত্যকে তুলে ধরেছেন। পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় প্রকাশ : শত্রুপক্ষ যীশু ভেবে অনুরূপ চেহারার জনৈক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যায় এবং ক্রুশ বিদ্ধ করে।

www.icsbook.info

স্বাভাবিক কারণেই বিরোধী মহলের এই প্রচারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য যীশু-সমর্থকদেরও জোর তৎপরতা চালাতে হয়। 'মানব-শিশু ও শিশু-মানব' উপশিরোনাম দিয়ে ইতোপূর্বে বলা হয়েছে : ধর্ম বলতেই যে অদ্ভুত অলৌকিক কার্যাবলীকে বোঝায় এবং যে ব্যক্তি এসব কাজে যত বেশি দক্ষ এবং যত বেশি তৎপর সে ব্যক্তি যে তত বড় মহাপুরুষ অথবা ঈশ্বরের অংশ, অবতার, সন্তান প্রভৃতির যেকোনও একটা এমন ধারণা তদানীন্তন কালের মানুষদের মন-মানসে শেকড় গেড়ে বসেছিল।

অতএব, যীশুখৃস্টের সমর্থকবৃন্দ এ সুযোগটি পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগানোর অভিপ্রায়ে যীশুখৃস্টকে 'ত্রাণকর্তা', 'ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্র' 'অন্যতম ঈশ্বর' 'নানা ধরনের অদ্ভুত অলৌকিক কার্যের অনুষ্ঠাতা', 'খৃস্ট-জগতের যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে প্রাণদানকারী', 'মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন লাভ করে সশরীরে স্বর্গে আরোহণ এবং স্বর্গীয় পিতার সিংহাসনে তাঁরই ডানপাশে উপবেশনকারী' প্রভৃতিরূপে চিত্রিত করার জন্য নানা ধরনের কল্প-কাহিনী রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

পরবর্তীকালের অতি-ভক্ত, অন্ধ-ভক্ত, কপট-বিশ্বাসী এবং স্বার্থানেষী ব্যক্তিরা এই সব কল্প-কাহিনী শুধু পবিত্র ইঞ্জিলের অন্তর্ভুক্তই নয়— বরং তার সাথে একাকার করে কার্যোদ্ধার অথবা ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন।

অতঃপর একান্ত বাধ্য হয়েই আমাকে আবার নামের প্রসঙ্গে ফিরে যেতে হচ্ছে। পুনঃ পুনঃ নাম নিয়ে এই ধৃষ্টতা প্রদর্শনের জন্য বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আশা করি, আমার এ কাজ ক্ষমা-সুন্দর চোখেই দেখা হবে।

নাম সম্পর্কে বলা আবশ্যক যে, ইঞ্জিল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য হল : 'সু সংবাদ' বা 'শুভ সংবাদ'। আর বাইবেল (বাইব্‌ল্) ও Testament শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে 'খৃস্টানদের ধর্মপুস্তক' ও 'উইল' বা 'ইচ্ছাপত্র'।

অতএব এটা বেশ সুস্পষ্টরূপেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, ইঞ্জিল নামটির যে-তাৎপর্য বাইবেল ও টেস্টামেন্ট নাম দ্বারা সে তাৎপর্য প্রকাশিত হয় না।

অবশ্য New Testament-কে 'গসপেলও' বলা হয়ে থাকে; আর বলা হয়ে থাকে যে, গসপেল শব্দের অর্থ হল 'সুসমাচার'। বাইবেলের বাংলা সংস্করণের নামও যে সুসমাচার রাখা হয়েছে; ইতোপূর্বে সেকথা আমরা জানতে পেরেছি। তবে বাইবেলে বহুসংখ্যক 'ক' বা দুঃখজনক সমাচার থাকার কারণে তার সুসমাচার নাম যে সঙ্গতিবিহীন এবং যথোপযোগী নয় ইতোপূর্বে যথাস্থানে সেকথাও আমরা বলেছি।

www.icsbook.info

বলা আবশ্যক যে, 'সুসংবাদ' এবং 'সুসমাচার' এই শব্দদ্বয়ের মধ্যে যে তাৎপর্যগত পার্থক্য রয়েছে তা খুবই সূক্ষ্ম এবং সকলের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। কিন্তু তাই বলে সুসমাচার অর্থকারীদের মত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যে এ পার্থক্য বোঝেন না এমন কথা কোনওক্রমেই মেনে নেয়া যায় না।

আমি মনে করি, বিশেষ একটি কারণে সাধারণ মানুষদের ভিন্ন পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যেই তাঁরা 'সুসংবাদ'কে 'সুসমাচার' বলে প্রচার করেছিলেন, আর এ কাজে তাঁরা যে সফল হয়েছিলেন তার প্রমাণ হলো, আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানে এত উন্নত হবার পরও সে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তাৎপর্যই অভ্রান্ত বলে ধরে রাখা হয়েছে।

পরবর্তী 'আসুন ভাল করে ভেবে দেখি' শীর্ষক নিবন্ধে অন্য কথার সাথে এ পার্থক্য সম্পর্কে বলা হবে বলে এখানেই এ প্রসঙ্গের ইতি করা হল।

পরিশেষে বলতে হচ্ছে, বিশ্ববিধাতাপ্রদত্ত এ ধর্মগ্রন্থখানার এমন শোচনীয় অবস্থার কথা জানার পর স্বভাবতই আমার মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। একজন ভুক্তভোগী এবং খৃস্টধর্মের প্রতি একটা বিশেষ অনুরাগ থাকার কারণে এ বেদনার মাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশিই ছিল। সাথে সাথে সেসব চিন্তাশীল এবং সংস্কারকামী খৃস্টান ভ্রাতা, যাঁরা সেদিনের ভীষণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অকুতোভয়ে এগিয়ে এসেছিলেন এবং নিকিও কাউন্সিলের বিখ্যাত অধিবেশনে গ্রন্থখানার ছ'ভাগের পাঁচ ভাগ বাদ দিয়েও অতীতের অজ্ঞ, অপরিণামদর্শী এবং পশ্চাৎমুখী কতিপয় মানুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত ভুলের সংশোধনে যত্নবান হয়েছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে যাঁরা ধরে রাখা সে ছ'ভাগের এক ভাগকে[১] গলদমুক্ত করার জন্যে ক্যান্টনবেরিতে মিলিত হয়ে ২৭ সদস্যবিশিষ্ট শক্তিশালী কমিটি গঠন করেছিলেন তাঁদের সকলের প্রতি বিশেষ একটা শ্রদ্ধার ভাবও মনে জেগে উঠেছিল।

আজও আমি তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করি। শুধু তাই নয়; দু'হাজার বছর পূর্বে কতিপয় ব্যক্তির অনুষ্ঠিত ভুল এবং অজ্ঞতার ফসলরূপী এ অচল ও বিকলাঙ্গ ধর্মগ্রন্থখানা নিয়ে বিড়ম্বনা ভোগকারী নির্দোষ-নিরপরাধ খৃস্টান ভ্রাতাভগ্নিদের মানসিক যাতনার কথাও আমি অন্তর দিয়ে অনুভব করি। আর এ যাতনা অবসানের পথ যেন তাঁরা খুঁজে পান সেজন্য বিশ্বপ্রভুর উদ্দেশ্যে আকুলভাবে প্রার্থনা জানাই।

---

১. ৩৬ ভানা ইঞ্জিলের মাত্র ৬ খানা এবং ১১৩ খানা পত্রের মাত্র ২১ খানা রাখা হয়েছে। ফলে ছ'ভাগের পাঁচ ভাগকেই বাদ দেয়া হয়েছে বলতে হবে।

www.icsbook.info

এতক্ষণ ইসা (আ) বা যীশুখৃস্টের প্রতি অবতীর্ণ ইঞ্জিল অর্থাৎ যা New Tastament বা সুসমাচার নামে চালু রয়েছে তার মৌলিকতা, সর্বজনীনতা এবং যুগোপোযগিতা কিভাবে ক্ষুণ্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে তার কিছু পরিচয় তুলে ধরা হলো। পরবর্তী নিবন্ধসমূহেও আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্পর্কীয় আরও কতিপয় তথ্য তুলে ধরা হবে।

অতঃপর হযরত মুসা (আ) ও হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থ যথাক্রমে তাওরাত ও যাবুরের নাম পরিবর্তনসহ বর্তমান অবস্থার কিছুটা পরিচয় তুলে ধরা যাচ্ছে :

আদিপুস্তক বা Old Testament-এর আসল নাম 'তাওরাত', হযরত মুসা (আ)-এর মাধ্যমে যা অবতীর্ণ হয়েছিল। সাধারণত যেসব কারণে ধর্মীয় বিধানের গোড়ায় গলদের অনুপ্রবেশ ঘটে এসেছে তাওরাতের বেলায়ও তার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি।

এ সম্পর্কে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে, তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার বহু পরে হযরত দাউদ (আ)-এর মাধ্যমে 'যাবুর' নামক গ্রন্থখানা অবতীর্ণ হয়েছিল। অতীতের সেই তাওরাত এবং পরবর্তী সময়ে অবতীর্ণ যাবুর একসাথে সংকলিত করে বাংলাভাষায় তার নাম দেয়া হয়েছে 'আদিপুস্তক' এবং Old Testament; উভয় ধর্মগ্রন্থ একত্রিভূত করা এবং নাম পরিবর্তনের দ্বারা তার মৌলিকতা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে কি না বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর উপরেই সেকথা ভেবে দেখার দায়িত্ব অর্পণ করে এ মৌলিকতা ক্ষুণ্ন হওয়া সম্পর্কীয় দু'একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে :

ইহুদীদের রাজা সোলাইমান (আ)-এর মৃত্যুর পরে ইহুদীসম্প্রদায় ১২টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের দুটি দল যথাক্রমে এহুদা ও বেনয়ামিন সোলেমান (আ)-এর পুত্র রহাবিয়ামকে নিজেদের রাজা বলে স্বীকার করে নেয়। অবশিষ্ট দশটি দল উত্তর দিকের সামারিয়া নামক স্থানে গমন করে রাজধানী স্থাপন করে এবং গো-বৎসের পূজা শুরু করে দেয়।[১]

খৃস্টপূর্ব ৭২২ অব্দে আসিরিওরা এ রাজ্য আক্রমণ করে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং ইহুদীদের বন্দী অবস্থায় নিনেভায় নিয়ে যায়। কালক্রমে এ দশটি দল বা বংশ পৌত্তলিকদের সাথে লীন হয়ে পড়ে বা ইহুদী হিসেবে এদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যায়।

---

১. ১ম রাজাবলী ১২; ১৮—৩০ পদ

www.icsbook.info

পক্ষান্তরে বহাবিয়াম প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটিও খৃস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে বাবেলিয়নের রাজা বখতে-নসর কর্তৃক আক্রান্ত হয়। উল্লেখ্য, সেসময় তাওরাত সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র এবং অন্যান্য পবিত্র পদার্থসমূহ জেরুসালেম বা বায়তুল মুকাদ্দস নামক মন্দিরে সংরক্ষিত হত।

এই আক্রমণে বখত-নসর রাজার নির্দেশে উক্ত মন্দিরটিতে অগ্নিসংযোগ করে তাওরাত ও পবিত্র দ্রব্যাদিসহ গোটা মন্দিরটি ভস্মস্তূপে পরিণত করা হয়।

রাজ-সৈন্যরা বহুসংখ্যক ইহুদীকে অতি নির্মমভাবে হত্যা করে এবং বাকিদের বন্দী করে রাজধানীতে নিয়ে যায়। অবশেষে খৃস্টপূর্ব ৫৩২ অব্দে পারস্যের রাজা কোরসের অনুগ্রহে বাইতুল মুকাদ্দস মন্দিরটির পুনঃ প্রতিষ্ঠা ঘটে। যেকোনও কারণেই হোক, রাজা আর্তথস্তের সাহায্য লাভ করে বন্দী ইহুদীরা মুক্তি লাভ করে এবং ব্যাবিলন থেকে জেরুসালেমে ফিরে আসে। যে ব্যক্তির প্রচেষ্টায় আর্তথস্তের সাহায্য লাভ সম্ভব হয়েছিল তার নাম ছিল ইস্রা বা আজরা। ইহুদীরা জেরুসালেমে ফিরে আসার পরে এলোকটি তাদের সম্মুখে কতগুলো কাগজপত্র উপস্থাপিত করেন এবং বলেন যে, এগুলোই মোশির ব্যবস্থা বা তাওরাত।[২]

একইরূপে প্রথম পঞ্চ-পুস্তক সংকলিত হওয়ার পর নহিমিয়া নামক আর এক ব্যক্তি কতকগুলো কাগজপত্র উপস্থাপিত করেন এবং বলেন, এটাই 'নবিম' নামক দ্বিতীয় ভাগের পুস্তকাবলী![৩]

এর পর খৃস্টপূর্ব ৬৮ অব্দে আন্তকিয়ার রাজা এন্টিনিউস ইহুদীজাতি ও তাদের ধর্মশাস্ত্রগুলো চিরতরে ধ্বংস করার সংকল্প নিয়ে ইহুদীরাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা শুধু মন্দিরটি এবং ধর্মপুস্তকসমূহ ভস্মীভূত করেই ক্ষান্ত হননি, মুখে মুখে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার ওপরেও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

পক্ষান্তরে রাজার আদেশে জেরুসালেমের মন্দিরকে 'জয়িস' নামক দেবতার মন্দিরে পরিণত করা হয় এবং মহাধুমধামের সাথে সেখানে উক্ত দেবতার পূজা চলতে থাকে।

ইতোমধ্যে মাকাবি নামক জনৈক ব্যক্তির উদ্যোগে রাজা এন্টিনিউস পরাজিত হন। এ ভাবে স্ব-জাতিকে মুক্ত করার পর উক্ত মাকাবি তাদের সম্মুখে কতগুলো বই-পুস্তক উপস্থাপিত করেন এবং বলেন, "এগুলোই আজরা এবং নহিমিয়া সংকলিত তোরা ও নবিম।" শুধু তা-ই নয়, এ ব্যক্তি এর তৃতীয় ভাগ হিসেবে 'কাতবিম' নামক একটি ভাগও তার সাথে জুড়ে দেন।

---

২. রাজাবলী ইস্রা ও নহিমিয়, ৭ম অ:

৩. মাকারিয় ২য় পুস্তক ২—১৩

www.icsbook.info

অতঃপর ৭০ খৃস্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর রোমান রাজ টাইটেস বা টাইটিউস ১৩৪ খৃস্টাব্দে কাইসর হেডরিন প্রভৃতি কর্তৃক ইহুদীরাজ্য অধিকার, ধ্বংসযজ্ঞ চালানো, মন্দিরসহ তাওরাতের যাবতীয় কাগজপত্রের ধ্বংস সাধন এবং জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক তওরাত নাম দিয়ে কতগুলো কাগজপত্র উপস্থিতকরণ প্রভৃতি ঘটনাগুলো পাঠকবর্গের ধৈর্যচ্যুতির আশঙ্কায় এখানে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো না। এ সম্পর্কে অন্যান্য তথ্যাদি অবহিত হওয়ার জন্যে আগ্রহী পাঠকবর্গকে Jewish Encyclopaedia ১০ম খণ্ড, ৩৬১, পৃঃ এবং rev. A. Streane কর্তৃক অনূদিত Chagiga Talmud-এর ভূমিকা ৭৩৮ পৃঃ পাঠ করার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি এবং ওপরোক্ত কার্যাবলী দ্বারা তাওরাতের মৌলিকতা ক্ষুণ্ন হয়েছে কিনা সেকথাও ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে রাখছি।

অতঃপর উৎসাহী এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের সাথে তাওরাত এবং যাবুরের বর্তমান অবস্থার কিছুটা পরিচয় ঘটানোর প্রয়োজন বোধ করছি। বিশেষ করে ইতোপূর্বে বাইবেলের শেষার্ধ অর্থাৎ New Testament বা বাইবেল নতুন নিয়মের মাঝে সন্নিবেশিত পুস্তক ও পত্রসমূহের উল্লেখ করার ফলে এখন সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যই বাইবেলের প্রথমার্ধ অর্থাৎ Old Testament বা বাইবেল পুরাতন নিয়মের মাঝে সন্নিবেশিত পুস্তকাদির নাম করতে হচ্ছে। অন্যথায় বিষয়টা অনেকের কাছেই বেখাপ্পা ঠেকতে পারে। অতএব যথাক্রমে তাওরাত ও যাবুরের মাঝে সন্নিবেশিত পুস্তকাদির নাম প্রথমে ইংরেজিতে এবং পরে বন্ধনীর মধ্যে বাংলায় তুলে ধরা হল :

তাওরাত

১। Genesis (আদিপুস্তক), ২। Exodus (যাত্রাপুস্তক), ৩। Loviticus (লেবীপুস্তক), ৪। Numbers (গণনাপুস্তক), ৫। Deuteronomy (দ্বিতীয় বিবরণ)। উল্লেখ্য, এ পাঁচখানা পুস্তক মোশি বা মুসা (আ)-এর নিকট অবতীর্ণ হয়েছিল বলে এগুলোকে 'মোশির পঞ্চপুস্তক' বলা হয়ে থাকে।

৬। Joshua (যিহোশূর), ৭। Judges (বিচার কর্তৃক বিবরণ) ৮। Ruth (রূতের ইতিহাস), ৯। Samuel (১ম শামূয়েল), ১০। 2 Samuel (২য় শামূয়েল), ১১। King (১ম রাজাবলী), ১২। 2 Kings (২য় রাজাবলী), ১৩। Chronicles (১ম বংশাবলী), ১৪। 2 Chronicles (২য় বংশাবলী), ১৫। Ezra (ইষ্রার পুস্তক), ১৬। Nehemiah (নহিময়) ১৭। Esther (ইস্টের পুস্তক)। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ওপরোল্লিখিত 'পঞ্চপুস্তক' ব্যতীত এ তালিকার

www.icsbook.info

৬—১৭ ক্রমিক সংখ্যায় যে ১২ খানা পুস্তকের নাম পাওয়া যায়, যার একখানাও মোশি বা মূসা (আ)-এর নিকট অবতীর্ণ নয়।

যাবুর

১৮। Job (আইউব), ১৯। Psalms (গীত-সংহিতা বা দায়ূদের গীত), ২০। Proverbs (সুলেমানের উপদেশ), ২১। Ecclesiastes (উপদেশক), ২২। Song of Solomon (সলেমানের পরমগীত), ২৩। Jsaiah (যিশায়াহ), ২৪। Jeremish (যরমিয়াহ্), ২৫। Lamentation (বিলাপ), ২৬। Ezekiel (যিহিস্কেল), ২৭। Daniel (দানিয়েল), ২৮। Hosea (হাশেয়), ২৯। Joel (যোয়েল), ৩০। Amos (আমোস), ৩১। Obadia (ওবদিয়), ৩২। Habakkuk (হবক্কুক), ৩৩। Zephaniah (সিফনীয়), ৩৪। Haggai (হগয়), ৩৫। Zechariah (সখরীয়), ৩৬। Malachi (মালাথি)।

বলাবাহুল্য, যাবুর বলতে সামগ্রিকভাবে উল্লেখিত এ ১৯ খানা পুস্তককেই বুঝানো হয়ে থাকে। যদিও একমাত্র 'গীত-সংহিতা' বা 'দাউদের গীত' ছাড়া আর কোনও খানাই দাউদ (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়নি।

উল্লেখ্য, তওরাত এবং যাবুরের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে যত সন্দেহ এবং যত মতভেদই থাক, মোশি বা মুসা (আ) এবং দাউদ (আ) এ উভয়েই যে প্রসিদ্ধ নবী-রাসূলদের অন্যতম এবং বিশ্ববিধাতাকর্তৃক যে তাঁদের ওপর যথাক্রমে তাওরাত এবং যাবুর অবতীর্ণ হয়েছিল সে সম্পর্কে কোনও সন্দেহ বা মতভেদ নেই।

এতদ্বারা আমি একথাই বোঝাতে চাচ্ছি যে, মোশি বা মুসা (আ) এবং দাউদ (আ)-এর প্রতি যেসব বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল বিশ্ববিধাতা সুনির্দিষ্টরূপে সেগুলোই যথাক্রমে তাওরাত এবং যাবুর নাম দিয়েছিলেন। অতএব ওপরোক্ত তালিকাদ্বয়ের প্রথমটিতে উল্লেখিত মোশির 'পঞ্চপুস্তক' এবং দ্বিতীয় তালিকায় 'গীতসংহিতা' বা 'দাউদের গীত' ছাড়া অন্য কোনও পুস্তককেই যথাক্রমে তাওরাত এবং যাবুর নামে আখ্যায়িত করা যেতে পারে না অথচ তা-ই করা হয়েছে। আর সে কারণেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা।

অবশ্য অন্যান্য পুস্তকগুলোর কোনও কোনওটির সাথে কোনও কোনও নবী-রাসূলের নাম জড়িত রয়েছে। এ থেকে যদি ধরে নেয়া হয় যে, মোশির পর এবং যীশু- খৃস্টের পূর্বপর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বনী ইসরাইলদের মধ্যে যেসব নবী-রাসূল আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের লব্ধ প্রত্যাদেশ বা তাঁদের প্রবর্তীত ধর্মীয় বিধি-বিধানসমূহ লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, যেহেতু তাওরাত বা

www.icsbook.info

যাবুরের অবতারণ এবং সংশ্লিষ্ট নবীদ্বয়ের তিরোধান এ উভয় কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরবর্তী সময়ে ওসব নবী-রাসূলের আবির্ভাব ঘটেছিল, অতএব তাঁদের কাছে অবতীর্ণ বাণীকে তাওরাত বা যাবুর বলার কোনও অবকাশ থাকে না।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, একমাত্র নবী-রাসূলরাই ধর্মীয় বিধি-বিধানের প্রয়োজনীয় সংস্কার সংশোধন করতে পারেন; আর তা-ও করতে হয়— একান্তরূপেই বিশ্ববিধাতার নির্দেশক্রমে! এমতাবস্থায়, যত জ্ঞান-প্রজ্ঞারই অধিকারী হোক না কেন, কোনও সাধারণ মানুষের পক্ষে এ কাজ করা যে শুধু অন্যায় এবং অসঙ্গতই নয়, ভীষণ ধরনের অনাধিকার চর্চাও সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

অতএব পরবর্তী সময়ের এসব বাণীকে যথাক্রমে তাওরাত ও যাবুর বলে আখ্যায়িত করা বা উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সাথে সংযোজনের এ ব্যাপার নিয়ে কোন প্রশ্ন দেখা দিত না, যদি তা বিশ্ববিধাতার নির্দেশক্রমে সংশ্লিষ্ট নবী-রাসূলদের কোনও একজনের দ্বারা সম্পাদিত হতো। দুঃখের বিষয়, কাজটিতো সেভাবে হই-ইনি বরং সংশ্লিষ্ট নবী-রাসূলদের তিরোধানেরও বহু পরে অন্য মানুষেরা নিজেদের ইচ্ছামত কাজটি সমাধা করেছেন। এমতাবস্থায় তাঁদের এ কাজকে অন্যায়, অসঙ্গত এবং ভীষণ ধরনের অনাধিকার চর্চা ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না।

আরও দুঃখজনক বিষয় হল, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নবী-রাসূলদের মাধ্যমে সমাগত এসব বাণীকে যথাক্রমে তাওরাত এবং যাবুরের অঙ্গীভূত করেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি, বর্ধিত কলেবরের এ তাওরাত এবং যাবুরকে একত্রিভূত করে সামগ্রিকভাবে তার নাম দিয়েছেন 'আদিপুস্তক' 'বাইবেল পুরাতন নিয়ম' বা Old Testament.

এ-ই তো হল নানা মুনির নানা মতের সংযোজন ও নাম পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্ববিধাতাপ্রদত্ত এ গ্রন্থদ্বয়ের মৌলিকতা ক্ষুণ্ন হওয়ার বহু কারণের একটি। অতঃপর আসুন, এ মৌলিকতা ক্ষুণ্ন হওয়ার আরেকটি মাত্র কারণের উল্লেখ করে আমরা প্রসঙ্গান্তরে গমন করি।

এ বাইবেল পুরাতন নিয়ম বা Old Testaments-এর স্থানে স্থানে এমন বহু পুস্তকের নাম পাওয়া যায়, যেগুলোর অস্তিত্বই ধরা পৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ প্রথমে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া কতিপয় পুস্তকের নাম এবং যেসব পুস্তকে উক্ত নাম রয়েছে পরে বন্ধনীর মধ্যে সেগুলোর নাম এবং পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে :

www.icsbook.info

(ক) সোলোমনের "তিন সহস্র প্রবাদবাক্য ও এক সহস্র পাঁচটি গীত (১ম রাজাবলী ৪ — ৩২);

(খ) সোলোমনের বৃত্তান্ত পুস্তক (ঐ ১১—৪২);

(গ) মোশির নিয়ম পুস্তক (যাত্রা পুস্তক ২৪ ঃ ৭);

(ঘ) সদাপ্রভুর যুদ্ধপুস্তক (গণনা পুস্তক ২১, ২৪);

(ঙ) যাশের পুস্তক (চিহোশুর ১০— ১৩);

(চ) নাথন ও ভাববাদীর পুস্তক (২ বংশাবলী ৯ — ২৯);

(ছ) শিলোনীয় অহিয়ের ভাব-বাণী— (ঐ);

(জ) ইদ্দোদর্শকের পুস্তক (ঐ);

(ঝ) হানানির পুত্র যেহুর পুস্তক (বংশাবলী ২—৩৪);

(ঞ) আমোসের পুত্র যিশাইর ভাববাদীর পুস্তক (ঐ ২৬; ২২); ইত্যাদি।

এতগুলো পুস্তক বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে মূল গ্রন্থের কতখানি ক্ষতি হয়েছে সেকথা ভেবে দেখা প্রয়োজন। কিন্তু তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখিত 'ভাববাদীদের' পুস্তকগুলো সম্পর্কে ভেবে দেখা।

কেননা, এদের অনেকেই নবী-রাসূল ছিলেন না। অতএব নিছক ভাবের উচ্ছ্বাস ছাড়া বিশ্ববিধাতার সাথে তাঁদের যেকোনও যোগসূত্র ছিল না সেকথা সহজেই অনুমেয়। এমতাবস্থায় সেসব ভাববাদী নিছক ভাবের উচ্ছ্বাসে যেসব কথা বলেছেন সেগুলোকে কোনওক্রমেই নবী-রাসূলদের মাধ্যমে সমাগত পবিত্র বাণীর সমতুল্য মনে করা যেতে পারে না। অথচ সমতুল্য মনে করা হয়েছে। আর মনে করা হয়েছে বলেই সেগুলোকে পবিত্র ধর্মগ্রন্থের অঙ্গীভূত করে নিতে দ্বিধাবোধও করা হয় নি।

আলোচনা আর দীর্ঘায়িত না করে অতঃপর অনায়াসেই একথা বলা যেতে পারে যে, এমনিভাবে মৌলিকতা ক্ষুণ্ন হওয়ার ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই এ ধর্মগ্রন্থটি সম্পর্কে জনমনে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। অন্য মানুষ তো বটেই, খোদ ইহুদী সম্প্রদায়ই যে এ বিভ্রান্তির করুণ শিকারে পরিণত হয়ে বিবদমান নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন তার দু'একটি প্রমাণ নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে :

এঁদের বিবদমান প্রধান দু'টি দলের নাম যথাক্রমে 'সাদুকী' ও 'ফরিশীয়'। সাদুকীদের কথা হল— "মোশির পঞ্চ পুস্তক ছাড়া অন্য কোনও পুস্তক আমরা মানি না। কেননা, অন্যগুলো Revelation বা ঈশ্বরের মুখ-নিঃসৃত বাণী নয়।"

www.icsbook.info

পক্ষান্তরে ফরিশীয়দের মতে, তোরা অর্থাৎ "তাওরাত" দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ 'লিখিত ঐশী বাণী'। মোশলী 'পঞ্চপুস্তক' এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত। আর দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে 'বাচনিকভাবে রক্ষিত ঐশীবাণীসমূহ'; অতএব সবগুলোই মানতে হবে।

এ সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদী অর্থাৎ সাদুকীদের যুক্তি হল, "ঐশীবাণী হলেও শতাব্দীর পরে শতাব্দী ধরে অলিখিত অবস্থায় ওগুলো হারুণ ও তাঁর বংশধর কর্তৃক হৃদয়াভ্যন্তরে সংরক্ষিত হওয়া অবশেষে এ বংশের সর্বশেষ ব্যক্তি ইস্রা কর্তৃক যাজকমণ্ডলীর হৃদয়ে স্থানান্তরিতকরণ, প্রায় তিনশত বছর পর যাজকমণ্ডলীর শেষ ব্যক্তি শামাউনের নিকট থেকে তা 'ছফরিম' বা ধর্মগ্রন্থ-লেখক এবং পরবর্তী সময়ে তাঁদের নিকট থেকে 'তানা-এম' বা পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকটে স্থানান্তরকরণ প্রভৃতি কারণে নানারূপ জাল এবং ভেজালের সংমিশ্রণ ঘটায় ওগুলোর মৌলিকতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় জাল এবং ভেজালের বোঝা বয়ে পণ্ডশ্রম করার কোনও মানে-ই হয় না"।

বলাবাহুল্য, দিনে দিনে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টির এমন বহু কারণই ঘটে গেছে। এ নিয়ে আর বেশি উদাহরণ তুলে ধরার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তবে আলোচনার অঙ্গহানি হবে বলে একান্ত বাধ্য হয়েই পাঠকবর্গের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে শেষবারের মতো আমাকে আবার নামের প্রসঙ্গে ফিরে যেতে হচ্ছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রত্যেক ভাষারই এমন কতগুলো বিশেষ বিশেষ শব্দ রয়েছে, যেগুলোর নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য এবং তাৎপর্য বিদ্যমান; অন্য কোনও ভাষায় সেগুলোর হুবহু কোনও প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। নামের বেলায় এ বিষয়টি সমধিক গুরুত্বের দাবি রাখে। সেই কারণে এক ভাষার কোনও বাক্যকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে গিয়ে নামটি অক্ষুণ্ন ও অপরিবর্তিত রাখা হয়। ব্যাকরণের চিরাচরিত নিয়মও এটা-ই।

অথচ এ নিয়ম-নীতি সম্পূর্ণরূপে লঙ্ঘন করে তাওরাত, যাবুর এবং ইঞ্জিল এ তিনটি নামেরই পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। ফলে জনমনে শুধু নিদারুণ বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি হয়নি, গ্রন্থত্রয়ের মৌলিকতাও ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, তাওরাত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য হল : 'জ্যোতি', 'আলো', 'স্তোত্র', 'পরমগীত', 'গীতসংহিতা' প্রভৃতি। আর যাবুর শব্দের ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য : 'স্তোত্র', 'বন্দনাগীতি', 'স্তবমালা' প্রভৃতি।

পক্ষান্তরে 'আদিপুস্তক' শব্দের তাৎপর্য 'প্রথম পুস্তক' হলেও এটাই যে বিশ্বের প্রথম পুস্তক দৃঢ়তার সাথে সেকথা বলা যেতে পারে না। তাছাড়া মূল তাওরাত বা 'মোশির পঞ্চপুস্তক'কে যদি বিশ্বের প্রথম বা আদিপুস্তক বলে ধরেও

www.icsbook.info

নেয়া হয় তথাপি সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। কেননা, মূল তাওরাত বা মোশির পঞ্চপুস্তক ছাড়াও পরবর্তী সময়ে আবির্ভূত কতিপয় নবী-রাসূল ও তথাকথিত 'ভাববাদী' বা সাধু-সজ্জনদের বাণীকে তাতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

শুধু তা-ই নয়, মোশির তিরোধানের বহুকাল পর দাউদের প্রতি অবতীর্ণ যাবুরকেও তথাকথিত আদিপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর যাবুরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে দাউদের পরে এবং যীশুখৃস্টের পূর্বে সমাগত নবী-রাসূল এবং তথাকথিত ভাববাদী ও সাধু-সজ্জনদের বাণীকে।

এমতাবস্থায় কয়েক হাজার বছরে বহুসংখ্যক নবী-রাসূল, ভাববাদী ও সাধু-সজ্জনদের মাধ্যমে লব্ধ প্রায় অর্ধশতাধিক পুস্তক নিয়ে তাও আবার অনধিকারী ব্যক্তিবৃন্দ কর্তৃক গড়ে তোলা এ নব বা অভিনব সংস্করণকে 'আদিপুস্তক' নাম দেয়ার কতটুকু যৌক্তিকতা থাকতে পারে এবং জ্যোতি, আলো বন্দনাগীতি, স্তবমালা অর্থাৎ তাওরাত ও যাবুরের ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্যের সাথে 'আদিপুস্তক' শব্দের কতটুকু সামঞ্জস্য রয়েছে সেকথা গভীরভাবে ভেবে দেখার জন্য সহৃদয় পাঠকবর্গ সমীপে সবিনয় অনুরোধ জানিয়ে রাখছি।

অনুরূপভাবে আদিপুস্তকের ইংরেজি নাম অর্থাৎ Old Testament শব্দের অর্থ হল 'পুরাতন নিয়ম', 'পুরাতন উইল' বা 'পুরাতন ইচ্ছাপত্র'। এ 'নিয়ম' 'উইল' বা 'ইচ্ছাপত্রে'র সাথে মূল নামের তাৎপর্য অর্থাৎ জ্যোতি, আলো, বন্দনাগীতি, স্তবমালা প্রভৃতির সামান্যতম মিলও রয়েছে কি না আশা করি বিজ্ঞ পাঠকবর্গ সেকথাও গভীরভাবে ভেবে দেখবেন।

ওপরের এ আলোচনা থেকে একথাও বুঝতে পারা সহজ যে মোটামুটিভাবে এই গ্রন্থত্রয় অর্থাৎ তাওরাত, যাবুর এবং ইঞ্জিলের ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য হল— যথাক্রমে জ্যোতি বা আলো, স্তবমালা বা বন্দনাগীতি এবং সুসংবাদ বা শুভসংবাদ।

অথচ, এ গ্রন্থত্রয়কে একত্রীভূত করে সামগ্রিকভাবে নাম দেয়া হয়েছে ইংরেজিতে 'বাইবেল' এবং বাংলাভাষায় 'সুসমাচার'। এখন বিশ্বপতির দেয়া নাম এবং মানুষের দেয়া নামের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য আছে কি না এবং বিশ্বপতির দেয়া ভিন্ন ভিন্ন তিনটি নামকে নস্যাৎ করে নিজেদের ইচ্ছামত গ্রন্থত্রয়কে একত্রিভূতকরণ এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন তাৎপর্য প্রকাশক একটি নামে মাত্র অভিহিত করার এ কাজ সঙ্গত এবং সমর্থনযোগ্য কি না আর এতদ্বারা গ্রন্থত্রয়ের মৌলিকতা ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে কি না সেকথা ভেবে দেখার দায়িত্ব বিজ্ঞ ও চিন্তাশীল পাঠকবর্গের ওপর ছেড়ে দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে গমন করছি।

www.icsbook.info

সর্বজনীনতা ও যুগোপযোগিতা

সহৃদয় পাঠকবর্গ অবশ্যই লক্ষ্য রেখেছেন যে, এতক্ষণ বাইবেলসহ তাওরাত ও যাবুরের মৌলিকতা সম্পর্কের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। অতএব আমার অনুসন্ধানের তিনটি বিষয়ের বাকি দুটি অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টধর্মের সর্বজনীনতা এবং যুগোপযোগিতা সম্পর্কে এখানে কিছু বলা প্রয়োজন।

তবে আলোচনা দীর্ঘায়িত করে ইতোমধ্যেই অনেকের বিরক্তি উৎপাদনের কারণ ঘটিয়েছি! তাছাড়া পুস্তকের কলেবরও আন্দাজের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে অগত্যা বাধ্য হয়েই সংক্ষিপ্ত পথ বেছে নিতে হচ্ছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রকৃত ইঞ্জিলের শিক্ষা কি ছিল, আজ আর সুনির্দিষ্টরূপে সেকথা জানার উপায় নেই। অতএব বর্তমান বাইবেল এবং তার অনুসারীদের কার্যকলাপের ওপর নির্ভর করে যতটুকু জানা সম্ভব ততটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

(ক) বাইবেলের অনুসারী অন্যদের কথা ছেড়ে দিয়ে আজ যেসব দেশ জ্ঞানে-গুণে, অর্থে-সম্পদে এবং প্রজ্ঞায়-প্রতিভায় সারা বিশ্বের সেরা বলে পরিচিত, সেসব দেশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেও দেখতে পাওয়া যাবে যে, তথাকার কৃষ্ণাঙ্গ খৃস্টানরা একই ধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র গাত্র-চর্ম কালো হওয়ার অপরাধে (!) তথাকার গৌরাঙ্গ খৃস্টানদের গীর্জা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হোটেল-রেঁস্তোরা প্রেক্ষাগৃহ, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রভৃতির কোনওটাতে প্রবেশাধিকার তো পাচ্ছেই না বরং ওসবের আশেপাশে গেলেও তাদের কুকুর-শৃগালের মত ঘৃণিত-লাঞ্ছিত এবং বিতাড়িত হতে হচ্ছে। বলাবাহুল্য, এমতাবস্থায় সে ধর্মের সর্বজনীনতা সম্পর্কে সন্দীহান না হয়ে পারা যায় না।

(খ) একই ধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, একের ধর্ম-মন্দিরে অপরের প্রবেশাধিকার না থাকা, এক সম্প্রদায় কর্তৃক অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থকে মিথ্যা, জাল ও ভেজালের সমষ্টি বলে মনে করা, বিশেষ করে নবদীক্ষিত খৃস্টানদের 'নেটিভ' আখ্যা প্রদান করে ঘৃণার চোখে দেখা এবং সমানাধিকার না দেয়া প্রভৃতি কার্যকলাপও যে সর্বজনীনতার সম্পূর্ণ বিরোধী, আশা করি সেকথা খুলে বলার প্রয়োজন হবে না। এ দুটি মাত্র বাস্তব নিদর্শনের পর আসুন বাইবেলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি :

(গ) বাইবেলের বর্ণনায় প্রকাশ : স্বয়ং ঈশ্বরই না কি যীশুখৃস্টের মাধ্যমে বলেছেন, "ইসরাইল-কুলের হারানো মেষ ছাড়া আমি কাহারও জন্য প্রেরিত হই নাই"। — মথি ১৫ : ২১ — ২৮

www.icsbook.info

"তোমাদের পবিত্র বস্তু (ধর্ম) শুকরদের (অন্য ধর্মাবলম্বীদের) সম্মুখে ফেলিও না, পরে তাহারা উহাকে পদদলিত করে এবং ফিরিয়া তোমাদের ফাঁড়িয়া ফেলে।" —ঐ

"সন্তানদের (ইসরাইলদের) খাদ্য (ধর্ম) কুকুরদের (অন্য ধর্মাবলম্বীদের) সম্মুখে দেওয়া উচিত নয়।" —ঐ

আশা করি, খৃস্টধর্মের সর্বজনীনতা সম্পর্কে আর কোনও উদ্ধৃতি তুলে ধরা বা কোনওরূপ মন্তব্য প্রকাশের প্রয়োজন হবে না। তবে এখানে যে কথাটি বলার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি তা হলো :

এ বিশ্ব নিখিলের যিনি স্রষ্টা, প্রভু এবং প্রতিপালক, সকলের ব্যবস্থাপকও যে তিনি-ই সে সম্পর্কে দ্বিমতের কোনও অবকাশ নেই। আর এ প্রতিপালন এবং ব্যবস্থাপনা তো বটেই, অন্য কোনও ক্ষেত্রে এবং অন্য কোনও অবস্থায়-ই তিনি যে কারও প্রতি কোনওরূপ অন্যায়, অবিচার এবং পক্ষপাতিত্ব করতে পারেন না সে সম্পর্কেও কোনওরূপ দ্বিমত নেই, থাকতে পারে না। সাধারণভাবে মানবকল্যাণ এবং বিশেষভাবে পাপী ও পথভ্রষ্ট মানুষদের সৎপথ প্রদর্শনই যে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য অন্তত তা-ই যে হওয়া উচিৎ সেকথাও কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

এমতাবস্থায় সেই মহান প্রভু কিভাবে বিশ্বের কোটি কোটি পাপী ও পথভ্রষ্ট মানুষের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্রও না করে শুধুমাত্র "ইসরাইল কুলের হারানো মেষদের পক্ষপাতি হতে পারেন, কিভাবে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে তার ধর্ম-রূপ পবিত্র বস্তুটি থেকে বঞ্চিত করতে পারেন এবং কিভাবে অন্য ধর্মের মানুষদের পাইকারীভাবে কুকুর-শুকর প্রভৃতি বলে আখ্যায়িত করতে পারেন বহু চেষ্টা করেও সেকথা আমি বুঝে উঠতে পারিনি।

তাছাড়া স্বয়ং ঈশ্বর যেখানে ওপরোক্ত তিন তিনটি নির্দেশের মাধ্যমে তাঁর ধর্মরূপ পবিত্র বস্তুটিকে তথাকথিত কুকুর-শুকর অর্থাৎ অন্য ধর্মের মানুষদের মধ্যে প্রচার-প্রতিষ্ঠা বা বিলি-বণ্টন তো দূরের কথা তাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করাকেও এমন সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং এ বিলি-বণ্টনকে শুধুমাত্র তাঁর সন্তান বা একমাত্র ইসরাইলদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশ যেখানে দিয়েছেন, সেখানে খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিরা কোন সাহসে এবং কোন যুক্তি বলে ঈশ্বরের এ সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করে খৃস্টধর্মরূপ পবিত্র বস্তুটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তথাকথিত কুকুর-শুকর অর্থাৎ অন্য ধর্মের মানুষদের মধ্যে বিলি বন্টন করে চলেছেন? অতীব লজ্জা এবং দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে

www.icsbook.info

যে, প্রায় সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী যাবত যথাসাধ্য চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত এ প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর আমি পাইনি।

হয়তো 'ত্রাণকর্তা' যীশু তাঁদের অর্থাৎ গোটা খৃস্টানজগতের "যাবতীয় পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে ক্রুশে প্রাণ দিয়েছেন" এ বিশ্বাসের বলেই তাঁরা এমন ধৃষ্টতা প্রদর্শনে সাহসী হয়েছেন। তবে অনেকে মনে করেন, যেহেতু ধর্মের প্রেরণায় নয়, বরং নিজেদের 'বিশেষ উদ্দেশ্য' সিদ্ধির মতলবেই তাঁরা এ কাজে ব্রতী হয়েছেন অতএব এর ফলও তাঁদের অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

বাইবেলের যুগোপযোগিতা সম্পর্কে নতুন করে কিছু লিখার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। কেননা, যুগোপযোগিতা না থাকার জন্য খোদ খৃস্টসমাজই যে পুনঃ পুনঃ তার সংস্কার-সংশোধনের কাজ চালিয়ে এসেছেন ইতোপূর্বে সে সম্পর্কে বহু তথ্য প্রমাণই তুলে ধরা হয়েছে। তথাপি আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমে ইহুদী সম্প্রদায় এবং পরে খৃস্টান সম্প্রদায় উপ-শিরোনাম দিয়ে দুটি নিবন্ধ তুলে ধরা যাচ্ছে।

ইহুদীসম্প্রদায়

বিরুদ্ধবাদী রাজশক্তি কর্তৃক পুনঃ পুনঃ ইহুদীরাজ্য আক্রান্ত হওয়া এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর ফলে অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও পবিত্র তাওরাত গ্রন্থ যে বহু পূর্বেই পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে তার ঐতিহাসিক প্রমাণাদি ইতোপূর্বে যথাস্থানে তুলে ধরা হয়েছে।

বর্তমানে আদিপুস্তক বা Old Testament নামে যে পুস্তকখানা চোখে পড়ে তাকে তাওরাত বলে মন্তব্য করা হলেও তা যে আসল তাওরাত নয় সেকথাও সেখানে বলা হয়েছে। সাথে সাথে তথ্য-প্রমাণাদিসহকারে একথাও বলা হয়েছে যে, আসল তাওরাত ভস্মীভূত হওয়ার পর তদানীন্তন কালের পাদ্রী পুরোহিতরা সত্য-মিথ্যা, আন্দাজ, অনুমান, কিংবদন্তী, জনশ্রুতি এবং প্রাচীনকালের অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ও প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কেচ্ছা-কাহিনী অবলম্বনে যে অভিনব পুস্তক রচনা করে তাওরাত নাম নিয়ে জোর করে সমাজের বুকে চাপিয়ে দিয়েছিল বর্তমানে তা-ই আদিপুস্তক বা Old Testament নামে বিদ্যমান রয়েছে।

এ নকল তাওরাত অর্থাৎ বর্তমানের আদি পুস্তক বা Old Testament-এর সাহায্যে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং বিশ্বপ্রভুর সত্যিকারের পরিচয় জানা এর কোনওটাই যে সম্ভব হতে পারে না; পুস্তকখানা পাঠ করার

www.icsbook.info

সাথে সাথেই সেকথা আমি সুস্পষ্টরূপেই বুঝতে পেরেছিলাম। বিশ্বপ্রভুর পরিচয় সম্পর্কীয় যেসব বিবরণ আমার এ বুঝতে পারার কাজে সহায়ক হয়েছিল পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তার মাত্র কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হল :

(ক) আদিপুস্তকের বর্ণনায় প্রকাশ : এক রাতে যাকোবকে একা পেয়ে সদাপ্রভু (ঈশ্বর) তার সাথে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু কিছুতেই তিনি তাঁকে কাবু করতে পারছিলেন না। অগত্যা সদাপ্রভুকে যাকোবের উরুদেশে প্রচণ্ড আঘাত করতে হয়, ফলে যাকোবের উরুদেশের হাড় ভেঙ্গে যায়। কিন্তু এতেও কোনও ফল হয় না বরং যাকোবের বাহু থেকে সদাপ্রভুর নিষ্ক্রমণই অসম্ভব হয়ে পড়ে। ওদিকে রাতেও শেষ হয়ে যায়। অগত্যা যাকোবের কাছে নতি স্বীকার করে ঈশ্বরের পক্ষে প্রভাতের পূর্বে অর্থাৎ রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করা সম্ভব হয়। — আদিপুস্তক ৩০ অঃ ২২ — ৩০ পদ

(খ) মিশরীয় প্রতিবেশিদের বস্ত্র ও মূল্যবান অলঙ্কারাদি চুরি করার জন্য ঈশ্বর ইসরাইদের আদেশ দিয়েছিলেন। — ঐ ৩ অঃ ২২ পদ

(গ) ফেরাউন রাজার দোষে মধ্য রাতে ঈশ্বর নেমে আসেন এবং মিশরের সমস্ত মানুষ ও পশুদের প্রথম জাতসন্তান ও শাবকদের সংহার করেন।

— ঐ ১২ অঃ ২০ পদ

(ঘ) ইসরাইলবংশের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বচক্ষে ঈশ্বরকে দর্শন করেন এবং মুখামুখি তাঁর সাথে তাদের কথোপকথন হয়। — ঐ ২৪ অঃ ৯—১০ পদ

(ঙ) বিশ্বপ্রভু সম্পর্কে ওপরোক্ত ধারণা-বিশ্বাস ছাড়াও হঠকারী স্বভাব, কৃপণতা, কুশীদ গ্রহণ, সর্বোপরী পুনঃ পুনঃ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সুবর্ণ নির্মিত গো-বৎসের পূজায় আত্মনিয়োগ প্রভৃতি ঘটনা ইহুদীসম্প্রদায়ের ইতিহাসকে চিরদিনের জন্য কলংকিত করে রেখেছে।

খৃস্টানসম্প্রদায়

পিতা (স্বয়ং ঈশ্বর), পুত্র (যীশু) এবং পবিত্রাত্মা (জিব্রাইল) এ তিন জনের প্রত্যেককে একেক জন স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ঈশ্বর বলে কল্পনা করেই যে পাদ্রী পুরোহিতরা সন্তুষ্ট হতে পেরেছিলেন না, এ তিন জন স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ঈশ্বরকে যে আবার একত্রে একজন স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ ঈশ্বররূপে কল্পনা করে নিয়ে এক অতি দুর্বোধ্য ও জঘন্য ধরনের ত্রিত্ববাদের জন্ম দিয়েছিলেন যথাস্থানে সে কথা বলা হয়েছে।

www.icsbook.info

বিশ্লেষণ করলে অবস্থাটা এ দাঁড়ায় যে, এক নম্বর ঈশ্বর অর্থাৎ সদাপ্রভুর আদেশে দু'নম্বর ঈশ্বর অর্থাৎ পবিত্রাত্মা (জিব্রাইল বা হোলিঘোস্ট) স্বর্গ থেকে আগমন করেন এবং মেরি নাম্নী নারীর গর্ভে তিন নম্বর ঈশ্বর অর্থাৎ যীশুখৃস্টের জন্মদান করেন। বাইবেলের বর্ণনায় প্রকাশ : এ মেরি হলেন যোসেফ নামক জনৈক সূত্রধরের স্ত্রী, যোসেফের সাথে সহবাসের পূর্বে জানা যায় যে, মেরি গর্ভবতী; তাঁর এই গর্ভ সঞ্চারিত হয়েছে পবিত্রাত্মা বা জিব্রাইলরূপী দু'নম্বর ঈশ্বরের দ্বারা!

সে যাহোক, যীশুর অন্তর্ধানের পর উদ্দেশ্যমূলকভাবেই যে তাঁকে ত্রাণকর্তা, অন্যতম ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্র হিসেবে উপাস্যের আসনে বসানো হয়েছিল সেকথা ইতোপূর্বে বলা হয়েছে। ক্রমশ এ অবস্থার অবনতি ঘটে এবং গীর্জাগৃহে যীশুর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সেই মূর্তির কাছে নতজানু হয়ে বন্দনা ও স্তবস্তুতি পঠিত হতে থাকে।

তথ্য-প্রমাণাদি থেকে জানা যায় : হযরত মুহম্মদ (স)-এর আবির্ভাব-পূর্ব সময়ে এই অবস্থার চরম অবনতি ঘটেছিল এবং ত্রাণকর্তা-রূপী যীশুর প্রতীক হিসেবে ক্রুশের কাঠ, যীশু অর্থাৎ অন্যতম ঈশ্বরের গর্ভধারিণী হিসেবে মেরি, সরাসরি স্বর্গের ছাড়পত্র দাতা হিসেবে পল, পিটার্স প্রভৃতি পোপ-পাদ্রীরা এবং পবিত্রাত্মার প্রতীক হিসেবে কবুতরের মূর্তিকে যীশু-মূর্তির পাশে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং মহা ধুমধামের সাথে পূজা-উপাসনার কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

এ উপাসনাকালে ওপরোক্ত মূর্তিসমূহের সম্মুখে নতজানু হয়ে যে বন্দনা-গীতি উচ্চারিত হয়ে থাকে নমুনাস্বরূপ তার কিছুটা অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে: :

(১) অল্প উন দু'হাজার ত্রিলোক ঈশ্বর যিনি
বর্ষ অগ্রে যে ঈশ্বর স্বর্গপুর ত্যাজি তিনি
বৈৎলেহেমের গো-শালাতে নরপ্রেমে হয়ে প্রেমী
করেন জন্ম ধারণ ॥ নরস্বামী তিনি দীন বেশে
জগতের রাজা যিনি শুয়ে আছেন যাবপাত্রেতে ॥
অতি দীনভাবে তিনি আইলেন পৃথিবীতে
করিতেন পাপ মোচন ॥

(২) ধন্য ধন্য ওগো মেরি হে ঈশ-জননী
প্রভু সদা তব সহকারী ॥ পৃথিবীর রাণী

www.icsbook.info

সর্বোপরিস্থ রাজার
তুমি আগমন দ্বার ॥
তিনি ঈশ্বরের মাতা হন
জানে তাহা সর্বজন ॥

তুমি গো ঈশ জননী
রমণীর শিরোমণি
পূর্ণ কৃপা পরায়ণী
ধন্য যীশু গর্ভ ফল তোমারি ॥[১]

জনৈক বাঙালি পাদ্রী কর্তৃক রচিত এবং বাংলাভাষী খৃস্টানদের দ্বারা পঠিত হলেও এ কবিতাটির মাধ্যমে যে মেরি এবং যীশু সম্পর্কীয় গোটা খৃস্ট-জগতের মনোভাবই তুলে ধরা হয়েছে সেকথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না।

কবিতাটিতে উল্লেখিত "অল্প উন দু'হাজার বর্ষ" থেকেই এটা যে সাম্প্রতিক কালে লিখিত সেকথা অতি সহজেই বুঝতে পারা যায়। আর সাথে সাথে এ কথাও বুঝতে পারা যায় যে, বাইরের দিক দিয়ে খৃস্টসমাজের কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হলেও ভেতর অর্থাৎ অন্তরের দিক দিয়ে তাঁরা কোনও অগ্রগতিই সাধন করতে সক্ষম হননি। অর্থাৎ অল্প উন দু'হাজার বর্ষ অগ্রে তাঁরা ধর্মীয় চিন্তাধারার দিক দিয়ে যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন আজও ঠিক সেখানেই রয়ে গেছেন।

---

১. অবিভক্ত বাংলার সুপ্রসিদ্ধ পাদ্রী আন্তনিও মারিয়েটি কৃত "ক্যাথলিক গীতাবলী" নামক পুস্তকের দশম গীত ও দূতের প্রার্থনা দ্রঃ (মুনসী মেহেরউল্লা প্রণীত "রদ্দে খৃস্টিয়ান" নামক পুস্তক থেকে কবিতাটি উদ্ধৃত করা হল— লেখক)।

www.icsbook.info

আসুন! ভাল করে ভেবে দেখি

খৃস্টধর্মের অনুসারী ভাই ও বোনেরা! উদ্বেগাকুল মন নিয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা হল। এগুলো সম্পর্কে ভাল করে ভেবে দেখবেন এবং অবিলম্বে কার্যকরী পদক্ষেপগ্রহণ করবেন এটাই আপনাদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ।

সারা বিশ্বে ধর্মবিরোধী অভিযান চালু থাকা এবং দিনে দিনে উক্ত চক্রটি শক্তিশালী হয়ে কিভাবে গোটা পৃথিবীকে ধর্মহীনতার সীমাহীন অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে সেকথা অবশ্যই আপনাদের জানা রয়েছে। পৃথিবীর বুক থেকে ধর্মকে চিরতরে মিটিয়ে দেয়াই যে তাদের একমাত্র না হলেও অন্যতম প্রধান লক্ষ্য আশা করি সেকথাও আপনাদের অজানা নয়। অতএব অবিলম্বে যথাযোগ্য পদক্ষেপ গৃহীত না হলে গোটা পৃথিবীই যে ধর্মহীনতার সীমাহীন অতলে ডুবে যাবে আশাকরি এ সহজ কথাটা আপনাদের বুঝিয়ে বলার কোনও প্রয়োজন হবে না।

আমরা যারা ধর্মকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের মাধ্যমে এই প্রাণাধিক প্রিয় ধর্মকে টিকিয়ে রাখার আশা পোষণ করি, একটু চোখ খুললেই দেখতে পাবো যে, আমাদের বংশধরেরা কিভাবে ক্রমবর্ধমান হারে সেই অশুভ চক্রের খপ্পরে পড়ে চরম ধর্মবিরোধী হয়ে গড়ে উঠছে।

আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখতে পেয়েছি যে, আমাদের স্নেহপ্রতীম বংশধরদের ধর্মবিরোধী করে গড়ে তোলার কাজে সেই অশুভ চক্রটি ধর্মকেই প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে চলেছে।

প্রথমত তারা ধর্মকে 'আফিম সদৃশ' 'শোষণের হাতিয়ার', 'বুর্জোয়াদের অস্ত্র', 'উদ্ভট ও অবাস্তব কল্পনা', 'বর্বর যুগের চিন্তার ফসল' প্রভৃতি বলে প্রচারণা চালিয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে এবং পরে তাদের এসব কথার সমর্থনে ধর্মশাস্ত্রের বিভিন্ন বাণী-বর্ণনা উদীয়মান তরুণ-তরুণীদের চোখের সম্মুখে তুলে ধরছে। ফলে এই চাক্ষুষ প্রমাণকে আমাদের সরলমতি ছেলে-মেয়েরা অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস না করে পারছে না।

www.icsbook.info

এ কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একমাত্র কুরআন ব্যতীত সবগুলো ধর্মগ্রন্থই নানা কারণে বিকৃত ও ভেজালে পরিপূর্ণ হয়েছে। প্রাচীনত্বের জন্য সেগুলোর অনেক কথা যুগের অনুপযোগীও হয়ে পড়েছে। আশা করি, এসব বিষয় আপনাদের মতো বুদ্ধিমান, সুচতুর এবং অনুসন্ধিৎসু জাতির চোখকে এড়িয়ে যেতে পারেনি।

আর ধর্ম-বিরোধী চক্রটি যে ওগুলোকেই তাদের মূলধন হিসেবে গ্রহণ করেছে সেকথা বলার প্রয়োজন হয় না। তবে আমি মনে করি যে, খৃস্ট-ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরাই জনসংখ্যা, ধন-সম্পদ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা-গবেষণা প্রভৃতির দিক দিয়ে সর্বাধিক উন্নত এবং অগ্রসর। তাছাড়া নানা কারণে খৃস্টানদেরই তারা নিজেদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে।

এমতাবস্থায় খৃস্টসমাজের মানুষদের অধিক সংখ্যায় ধর্মবিরোধী করে গড়ে তোলাকে তারা যে নিজেদের কার্যোদ্ধারের সহজ ও সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হিসেবে বেছে নেবে তাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু থাকতে পারে না। আর এভাবে খৃস্টসমাজকে ধরাশায়ী করতে পারলে অন্যদের ধরাশায়ী করা যে তাদের পক্ষে মোটেই কঠিন হবে না সেকথা খুলে বলার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

সমালোচনা অথবা নিন্দা প্রচারের সামান্যতম ইচ্ছাও যে আমার নেই— অবস্থার ভয়াবহতা উপলব্ধি করেই যে আমি আপনাদের স্মরণাপন্ন হয়েছি শুরুতেই সেকথা বলা হয়েছে। যেহেতু আপনারাই উক্ত ধর্মবিরোধী চক্রটির প্রধান লক্ষ্য, অতএব আপনাদের ধর্মীয় গ্রন্থের যেসব গলদ তারা মূলধন হিসেবে গ্রহণ করেছে অচিরাৎ সেগুলো দূর করা অথবা বিশেষভাবে চিহ্নিত করা এবং কিভাবে ও কি কারণে পবিত্র ইঞ্জিলের মাঝে ওসবের অনুপ্রবেশ ঘটেছে অন্তত নিজেদের বংশধরদের সম্মুখে সেকথা সবিস্তারে তুলে ধরা প্রয়োজন।

বিশেষ করে প্রোটেস্টান্ট ভ্রাতা-ভগ্নিদের কাছে আমার বিনীত আবেদন : আপনাদেরই পূর্বপুরুষরা ৩২৫ খৃস্টাব্দে নিকিও কাউন্সিল (Council of Niceo) এবং ১৮৭০ খৃস্টাব্দে ইংলন্ডের ক্যান্টনবরি অধিবেশনে গঠিত কমিটি কর্তৃক বাইবেলের ছ'ভাগের পাঁচ ভাগকেই গলদ হিসেবে বাদ দেয়ার মতো সৎসাহস দেখিয়ে ছিলেন। আশা করি, যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে আপনাদের মধ্যেও সে সৎসাহস রয়েছে। অতএব আজও তার মধ্যে যেসব গলদ রয়ে গেছে, বেছে বেছে সেগুলো বাদ দেয়ার কাজে আপনারাও যে কোনও ত্রুটি করবেন না দৃঢ়রূপেই সে বিশ্বাস আমি পোষণ করি। এ কাজে সহায়তা দানের জন্য উক্ত গলদসমূহের কয়েকটি নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা হল।

www.icsbook.info

অবশ্য এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, যেখানে ছ'ভাগের পাঁচ ভাগই ইতোপূর্বে গলদ হিসেবে বাদ দেয়া হয়েছে সেখানে পুনরায় গলদ বাছতে গেলে অবশিষ্টের কতটুকুইবা আর টিকে থাকবে?

এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ আমি মনে করি যে, খাঁটি জিনিসের পরিমাণ যত অল্পই হোক সত্য-সাধকদের যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে তাকে নিয়েই গর্বের সাথে মাথা তুলে দাঁড়ানো সম্ভব। আর যদি গলদ হিসেবে সবটুকু বাদ দিতে হয় তাতেও পশ্চাৎপদ না হওয়াকে আমি গৌরবজনক বলে মনে করি। কেননা, গলদের বোঝা বয়ে একদিকে আত্মসম্মান খোয়ানো অপেক্ষা শূন্যতা অনেক ভাল, অন্তত মন্দের ভাল তো বটেই। অবশ্য এগুলো আমার অতি নগণ্য অভিমত। গ্রহণ করা বা না করা একান্তরূপেই আপনাদের অভিরুচির ওপর নির্ভর করছে। তবে গ্রহণ করুন আর না করুন অন্তত ভালভাবে ভেবে দেখবেন এই আশা নিয়েই অতঃপর আজও বাইবেলে যেসব গলদ রয়েছে বলে আমি মনে করি ভালভাবে ভেবে দেখা এবং ইতি কর্তব্য নির্ধারণের অনুরোধ জানিয়ে তার কতিপয়কে নিম্নে তুলে ধরছি।

০ এ সম্পর্কে প্রথমেই বাইবেল বর্ণিত যীশুর জন্মবৃত্তান্ত তুলে ধরা যেতে পারে :

বাইবেলে বলা হয়েছে যে "যীশু সদাপ্রভু বা ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্র" (প্রেরিত ৮-৩৭)। অবশ্য গোটা খৃস্টানজগতও সর্বান্তঃকরণে এই বিশ্বাসই পোষণ করে থাকেন।

অথচ এটা একটি সর্ববাদীসম্মত সত্য যে, 'ঔরসজাত পুত্র' হওয়ার জন্যে যৌন সম্পর্ক একান্তরূপেই অপরিহার্য। অন্যদিকে, ঈশ্বর কর্তৃক কারও সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে একমাত্র পাগল অথবা মতলববাজ ছাড়া অন্য কোনও মানুষই একথা বিশ্বাস করতে পারে না। অবশ্য বাইবেলও এরূপ কোনও সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার কথা বলেনি।

বাইবেলে বলা হয়েছে, মেরির স্বামী যোসেফ, সহবাসের সময় জানা গেল যে মেরি গর্ভবতী এবং এ গর্ভের সঞ্চার হয়েছে, পবিত্রাত্মা বা জিব্রাইল (গেব্রীয়েল) কর্তৃক। — যোহন ১৮

ফেরেশতা বা স্বর্গীয় দুতেরা মানুষ নয়। এমতাবস্থায় তাদের দ্বারা মানুষের গর্ভ-সঞ্চার সম্ভব কি না সে প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও মেরি যে সদাপ্রভু বা ঈশ্বর কর্তৃক গর্ভবতী হয়েছিলেন না এতদ্বারা সেকথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এখন প্রশ্ন হল : ঈশ্বরের দ্বারা গর্ভবতী না হওয়া সত্তেও কি উদ্দেশ্যে সেই গর্ভের সন্তানকে ঈশ্বরের ঔরসজাত বলা হয়ে থাকে?

www.icsbook.info

আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রশ্নের উত্তর অন্যত্র দেয়া হয়েছে। তথাপি আলোচনার সঙ্গতি রক্ষার জন্যে বলতে হচ্ছে :

খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদের অবশ্যই একথা জানা রয়েছে যে, অবিবাহিতা অবস্থায় অলৌকিকভাবে মেরির গর্ভসঞ্চার এবং সেই গর্ভে যীশুখৃস্টের জন্মলাভকে কেন্দ্র করে অতি নগণ্যসংখ্যক স্বজন-পরিজন ছাড়া গোটা ঈহুদী সম্প্রদায়ই কিভাবে ক্ষিপ্ত এবং বেসামাল হয়ে উঠেছিল।

তারা যে মেরি এবং যীশুকে শুধু সমাজচ্যুত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেই ক্ষান্ত হয়েছিল না বরং যীশু জীবনের তেত্রিশটি বছর[১] ধরে এমনি ধরনের অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে শেষপর্যন্ত তাঁকে ভণ্ড, জারজ, অভিশপ্ত, ধর্ম ও রাষ্ট্রদ্রোহী প্রভৃতি বলে অভিযুক্ত ও ক্রুশবিদ্ধ করে অতি নির্মমভাবে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয়নি, আশা করি খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদের সেকথাও অজানা নয়।

সর্বাধিক দুঃখজনক বিষয় হল : এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠানের পরও ইহুদী সম্প্রদায়ের জিঘাংসার নিবৃত্তি হয়েছিল না, তারা তাদের এই হত্যাকাণ্ডকে যথার্থ ও যথাযোগ্য প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়ে যীশুকে ভণ্ড, জারজ, অভিশপ্ত প্রভৃতি বলে প্রচারণার কাজ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছিল।

বলাবাহুল্য, 'যাঁর ইচ্ছা বা আদেশে সবকিছু হয়ে যায়' তাঁরই ইচ্ছা বা আদেশে মেরির গর্ভসঞ্চার হওয়াটা অস্বাভাবিক হলেও অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য ছিল না।

অথচ যীশুসমর্থকরা ইহুদীসম্প্রদায়ের ওপরোক্ত প্রচারণার মোকাবিলা করতে গিয়ে এই সহজ-সরল কথাকে সার্থকভাবে তুলে ধরার পরিবর্তে 'ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্র' যীশুকে 'অন্যতম ঈশ্বর', 'ত্রাণকর্তা' প্রভৃতি বলে প্রতিপন্ন করার মত ভুল পদক্ষেপই গ্রহণ করে ছিলেন, যা সত্য বলে প্রমাণ করার কোনও সাধ্যই তাদের ছিল না। শুধু তাই নয়, এটা যে শুধু অন্যায়, অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্যই নয় বরং ঈশ্বরের পবিত্রতা, ইচ্ছাময়ত্ব, সার্বভৌমত্ব এবং সর্বশক্তিমানত্বেরও ঘোরপরিপন্থী সেকথাটা ভেবে দেখার প্রয়োজনও তাঁরা বোধ করে ছিলেন না। মোট কথা :

একদিকে ইহুদীদের এই জঘন্য প্রচারণার প্রত্যুত্তর দেয়া এবং অন্যদিকে সাধারণ খৃস্ট-ভক্তদের মনোবল চাঙ্গা করে তোলা এই উভয় উদ্দেশ্য সাধনের সহজ উপায় হিসেবে তদানীন্তন যীশুসমর্থকরা যীশু সম্পর্কে এসব অলৌকিক ও

---

১. প্রকৃত অবস্থা যাই হোক, বাইবেলের বর্ণনা থেকে জানা যায়, যীশুখৃস্ট ত্রিশ বছর বয়সে প্রত্যাদিষ্ট হন এবং মাত্র তেত্রিশ বছর বয়ক্রম কালে শত্রু কর্তৃক ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহত হন।

www.icsbook.info

অতিমানবিক কার্যকলাপের কল্পকাহিনী রচনা করে সেগুলোকে ঈশ্বরের বাণী হিসেবে চালিয়ে দেয়ার জন্য বাইবেলের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন।

শুধু ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্রই নয়, যীশুকে অন্যতম ঈশ্বরও বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বাইবেল থেকে যীশুর উক্তি বলে কথিত কতিপয় বাক্য তুলে ধরা যেতে পারে। যথা :

"আমাতে পিতা আছেন এবং পিতা আমাতে আছেন।" —যোহন ১০/৩৮

"আমি পিতাতে আছি ও পিতা আমাতে আছেন— আমার এই কথাতে প্রত্যয় কর।" —ঐ ১/১১

"আমি ও পিতা উভয়ই এক।" —ঐ ১০/৬০

"যীশু ও ঈশ্বর এক এবং তিনি পূর্ণ ঈশ্বর।"

— জেমস্ ভন কৃত 'সফল ভবিষ্যৎবাণী' ৩২৮ পৃঃ

পক্ষান্তরে এই বাক্যগুলোর বিপরীত বাক্যও বাইবেলে পরিলক্ষিত হয়। যেমন :

"যাহারা ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া পালন করে তাহারাই আমার মাতা এবং ভ্রাতা।" —লুক ৮/২১

"আমি আপন হইতে কিছু করিতে পারি না কেননা, আমি আপন ইষ্ট চেষ্টা না করিয়া আপন প্রেরণকর্তা পিতার ইষ্ট চেষ্টা করি।" —যোহন ৫/৩০

"অদ্বিতীয় সত্য পরমেশ্বর তুমি আর (আমি) তোমার প্রেরিত মসীহ্।"

—যোহন ১৭/৩

উল্লেখ্য, এমনি ধরনের বহু বাক্যই বাইবেলে রয়েছে যদ্বারা একথা বুঝতে পারা মোটেই কঠিন হয় না যে, যীশু কোনও দিনই ঈশ্বরত্বের দাবি করেন নি। এ থেকে বুঝতে পারা সহজ যে, "তিন-এ এক এবং এক-এ তিন" এই অদ্ভুত থিওরি উদ্ভাবন ও যীশু কর্তৃক ঈশ্বরত্বের দাবি সম্পর্কীয় যেসব বাক্য ওপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে সেগুলো সবই পূর্বোক্ত নেতৃমণ্ডলীর রচিত।

প্রণিধানযোগ্য, বিশ্বপ্রভুর নিকট থেকে যীশুর নিকটে ইঞ্জিল নামক ধর্ম-গ্রন্থটি অবতীর্ণ হয়েছিল। ধর্মগ্রন্থে থাকে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের আদেশ ও নিষেধসম্বলিত বাক্য। একথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, একমাত্র প্রভু কর্তৃকই ভৃত্যের প্রতি আদেশ নিষেধাদি প্রদত্ত হয়ে থাকে। অতএব যীশু যদি ঈশ্বর হতেন তবে অন্য ঈশ্বর কর্তৃক তৎপ্রতি আদেশ প্রদত্ত হতো না। বলাবাহুল্য, এদ্বারা ঈশ্বর ও যীশুর মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কই সূচিত হচ্ছে।

www.icsbook.info

খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিরা একটু ভাল করে ভেবে দেখলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে, প্রকৃতই যিনি ঈশ্বর তাঁর জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি থাকতে পারে না এবং অসীম অনন্ত হিসেবে সসীম কোনও অবয়বও তাঁর থাকা সম্ভব নয়। অতএব যেহেতু যীশু জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতির অধীন ছিলেন এবং মানুষের মতো একটি দেহের অধিকারীও তিনি ছিলেন। অতএব তিনি কোনওক্রমেই ঈশ্বর হতে পারেন না।

যীশুখৃস্টকে ত্রাণকর্তা বলা হয়ে থাকে। কারণ স্বরূপ বলা হয়ে থাকে যে, যেহেতু খৃস্টজগতের পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে তিনি ক্রুশে প্রাণ দিয়েছেন, অতএব তিনি ত্রাণকর্তা।

তাঁদের এই কথার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, বাইবেলের বর্ণনা মতে যীশুখৃস্টের জনৈক সহচর শত্রুপক্ষের নিকট থেকে ত্রিশটি টাকা ঘুষ খেয়ে তাঁকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল এবং সে কারণেই তিনি যে অকস্মাৎ এবং অপ্রত্যাশিতরূপে ধরা পড়েছিলেন এবং প্রায় সাথে সাথেই নিহত হয়েছিলেন— খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদের মনে সে সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহও যে নেই এবং থাকা যে উচিত নয়, সেকথা নিশ্চিতরূপেই ধরে নেয়া যেতে পারে।

এমতাবস্থায় তিনি যে "সকলের পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে প্রাণ দিলেন" এবং "তাঁর এই পবিত্র রক্ত তথা প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের প্রতি বিশ্বাস" স্থাপন করা মাত্রই যে বিশ্বাসকারীদের জীবনের সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও ত্রাণলাভ অবধারিত হয়ে উঠবে, এমন কথা বলে যাওয়ার কোনও সুযোগ নিশ্চিতরূপেই তিনি পাননি, পাওয়া সম্ভবই ছিল না। কেননা, তখন তিনি ছিলেন শত্রুর হাতে বন্দী।

অতএব এই ত্রাণকর্তা হওয়া সম্পর্কীয় যেসব কথা বাইবেলে বিদ্যমান রয়েছে সেগুলো কোনওক্রমেই যীশুখৃস্টের উক্তি হতে পারে না। অর্থাৎ এই বাক্যগুলোও পূর্বকথিত নেতৃবৃন্দ কর্তৃক রচিত ও বাইবেলে সন্নিবেশিত হয়েছে।

খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদের মধ্যে চিন্তাশীল ও জ্ঞানীগুণী মানুষ যথেষ্টই রয়েছেন। নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে তাঁরা একটু ভালভাবে ভেবে দেখবেন, এটাই তাঁদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ।

(ক) বিশ্বপ্রভু অর্থাৎ বিচারের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব যাঁর হাতে তিনি ব্যতীত অন্য কারও ত্রাণকর্তা হওয়া সম্ভব কি না?

(খ) পাপানুষ্ঠানের ফলে মানুষের আত্মা দুর্বল বা কলুষিত হয়ে থাকে। অতএব ব্যক্তিগতভাবে অনুতাপ-অনুশোচনা বা বিধিসঙ্গত প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান দ্বারা আত্মার এই দুর্বলতা বা কলুষ-কালীমা বিদূরণ সম্ভব। এমতাবস্থায় একজন কর্তৃক অন্য জনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোনওরূপ ফলদায়ক হতে পারে কি না?

www.icsbook.info

(গ) এমনি পাইকারীভাবে 'পাপ-মুক্তি' ঘোষণার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে অবাধে এবং মনের সাধ মিটিয়ে পাপানুষ্ঠানের কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে কি না। এবং এই সুযোগ করে দেয়ার ফলেই খৃস্টজগত এমনভাবে পাপের তাণ্ডবে মেতে ওঠার সুযোগ ও প্রেরণা পেয়েছে কি না।

(ঘ) একথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ধর্মীয় বাণী-বাহকগণ শুধু বাণীই বহন করেন না; তাঁরা নিজদের জাতির সম্মুখে আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিতও করেন। আর সেই আদর্শ থেকে প্রেরণা ও পথনির্দেশ লাভ করে জাতি আদর্শ হয়ে গড়ে ওঠে।

অথচ অতীতের মহা পুরুষদের জীবনীকে এমনভাবেই বিকৃত অতিরঞ্জিত করা হয়েছে যে, তাঁদের সত্যিকারের চরিত্র কি ছিল তা জানার কোনও উপায়ই আজ আর নেই।

যীশুখৃস্টের বেলায়ও এর কোনও ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না। তাঁকে অন্যতম ঈশ্বর, ত্রাণকর্তা, ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্র, প্রভৃতিরূপে কল্পনা করে একেবারে উপাস্যের পর্যায়ে উন্নিত করা হয়েছে। ফলে খৃস্টানদের পক্ষে তাঁর চরিত্রের অনুকরণ-অনুসরণ করা তথা আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে ওঠার পথ চিরদিনের জন্য রূদ্ধ হয়ে গেছে।

যীশুখৃস্টের অতি মানবীয় চরিত্রের কথা বাদ দিয়ে মানবীর চরিত্রের যেটুকু পরিচয় বাইবেল থেকে পাওয়া যায় তাও এমনই অদ্ভুত ধরনের যে, কোনও মানুষের পক্ষেই তাঁর অনুকরণ-অনুসরণ সম্ভব হতে পারে না, তা করতে গেলে নির্মম ধ্বংসই অনিবার্য করে তোলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, তিনি জীবনে বিবাহ, ঘর-সংসার, অর্থোপার্জন প্রভৃতির কোনওটাই করেননি। এমনকি তাঁর ভক্ত-অনুরক্তদের এসব কাজে নিরুৎসাহিতও করেছেন। শুধু তাই নয়, বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী জানা যায় : তিনি না কি একথাও বলেছেন যে, "সূঁচ-এর ছিদ্র দিয়ে গর্ভবতী উষ্ট্রির গমনাগমন সম্ভব হলেও ধনি ব্যক্তিদের জন্য স্বর্গে গমন সম্ভব নয়।"

এ সম্পর্কে বলার মতো বহু কথাই ছিল। কিন্তু স্থানাভাববশত তা সম্ভব হচ্ছে না। অতএব, মাত্র দুটি কথা বলেই প্রসঙ্গের ইতি টানতে হচ্ছে।

(ঙ) পাদ্রী পুরোহিতদের অতি নগণ্যসংখ্যক ছাড়া যীশুখৃস্টের সম-সাময়িক ভক্ত-অনুরক্তরা থেকে শুরু করে আধুনিককালের খৃস্টানরা যীশুখৃস্টের আদর্শ নিদারুণভাবে অমান্য করে চলেছেন বা চলতে বাধ্য হয়েছেন। অন্যথায় যীশুখৃস্টের তিরোধানের পর পরই এই ধর্মের নাম-নিশানা চিরতরে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতো।

www.icsbook.info

আমার এই কথার যথার্থতা যাঁচাই করার জন্য আমি খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদের শুধু একটি কথাই ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি যে, যীশু খ্রিস্টের সমসাময়িক ভক্ত-অনুরক্তরা এবং তাঁর শিষ্যমন্ডলী যদি যীশুখৃস্টের এই আদর্শে জীবন গড়তে গিয়ে বিবাহ, সংসার-ধর্মপালন এবং অর্থোপার্জন থেকে বিরত থাকতেন তবে তাঁদের মৃত্যুর সাথে সাথেই চিরদিনের জন্য খৃস্টধর্মের অবসান ঘটতো এবং আজও যদি খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিরা যীশুখৃস্টের আদর্শে জীবন গড়তে উদ্যোগী হন তবে অবশ্যই তাঁদের উল্লেখিত তিনটি কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। ফলে অন্যান্য বহু অসুবিধা ছাড়াও বংশ-বৃদ্ধির সুযোগ না থাকায় তাঁদের মৃত্যুর সাথে সাথে খৃস্টধর্মেরও মৃত্যু ঘটবে। কথাটি এভাবেও বলা যেতে পারে যে, ধর্মের যিনি বাহক অর্থাৎ যাঁর মাধ্যমে ধর্মটির উদ্ভব ঘটলো তাঁর আদর্শ বাদ দিয়ে যেধর্ম টিকিয়ে রাখতে হয় সেধর্মকে সত্যিকার অর্থে ধর্ম বলার কোনও অবকাশই থাকে না।

একথা আমাদের বেশ ভালভাবেই জানা রয়েছে যে, বিবাহ, অর্থোপার্জন এবং সংসারধর্ম পালনের সাথে মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। তাছাড়া, পেটের ক্ষুধা, যৌনক্ষুধা এবং নিরাপদ ও শান্তিপ্রদ আশ্রয়ের ক্ষুধা সাধারণত মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে আর এই সমস্যাত্রয়ের সমাধান করতে গিয়েই মানুষ ভুলবশত পাপ-দুর্নীতি, অন্যায়-অবিচার ও শোষণ-নির্যাতনের কাজে লিপ্ত হয়। এমতাবস্থায় যেধর্ম এমন তিন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনও পথ-নির্দেশ তো দেয়ই না বরং ভ্রান্তপথে পরিচালিত হওয়ার এবং স্বেচ্ছাচারিতার পথ বেছে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে সেধর্ম মানুষের গ্রহণযোগ্য হতে পারে কি না সেকথাটিও ভাল করে ভেবে দেখার জন্য খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদের বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়ে রাখছি।

(চ) এ বিষয়টিও ভালভাবে ভেবে দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি যে, মথি ২৭ অঃ ২৭-৫০ পদ, মার্ক ১৫ অঃ ১০-৩৮ পদ, লুক ২৩ অঃ এবং যোহন ১৯ অঃ বাইবেল থেকে জানা যায় যে, শত্রু-হস্তে বন্দী হওয়ার পর শত্রুরা যীশুর পবিত্র গণ্ডে চপেটাঘাত করে, মাথায় কাঁটার মুকুট পরায়, মুখে থু থু দেয় এবং পিপাসা নিবৃত্তির জন্য পানির বদলে সিরকা পান করায়। অবশেষে ক্রুশে বিদ্ধ করে নিহত করে। ক্রুশে বিদ্ধ করার প্রাককালে তিনি "হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভু! কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে" বলে আর্তনাদ করেন।

এখন ভেবে দেখার বিষয় হল : যিনি এই অত্যাচার এবং অকাল মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে ত্রাণ করতে পারলেন না বরং ত্রাণ না করার জন্য নিজ প্রভুকে অভিযুক্ত করলেন, তিনি কি করে অন্যতম ঈশ্বর, ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্র এবং কোটি কোটি মানুষের ত্রাণকর্তা হতে পারেন?

www.icsbook.info

(ছ) বাইবেল, যিহিস্কেল ১১ অ: ৩১ পদ, ১৮ অ: ২০ পদ এবং ২২ অ: ৩১ পদে যথাক্রমে লিখিত রয়েছে "যেপ্রাণী পাপ করে সেই মরবে, পুত্র পিতার অপরাধ ভোগ করিবে না ও পিতা পুত্রের অপরাধ ভোগ করবেন না, ধামিক আপন ধর্মের ফল ভোগ করবে ও দুষ্ট আপন দুষ্টমির ফল ভোগ করিবে।"

এখন ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, প্রতিটি মানুষকে যদি ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ পাপের ফল বা প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হয় তবে প্রায়শ্চিত্ত বাদ (Doctrine of Atonement) বা "যীশু নিজেই খৃস্টজগতের যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন; সুতরাং খৃস্টানরা যত পাপই করুন না কেন সেজন্যে তাঁদের তার কোনওরূপ শাস্তি বা প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হবে না", বাইবেলের এই উক্তি স্ববিরোধী, অযৌক্তিক এবং বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য কি না আর এতদ্বারা ধর্ম-বিরোধী চক্রটি ধর্মকে 'মিথ্যা', 'বর্বর যুগীয়', 'আফিমসদৃশ' প্রভৃতি বলার সুযোগ পেয়েছে কি না?

(জ) অতঃপর ভাল করে ভেবে দেখার জন্যে ইতিহাসের পাতা থেকে কয়েকটি ঘটনা আমার খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদের সম্মুখে তুলে ধরছি :

০ ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় (অর্থাৎ ইসলাম যখন পরিপূর্ণরূপ পরিগ্রহ করেনি) দেশবাসী কর্তৃক নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত ও নও-মুসলিমদের আবিশিনিয়ায় আশ্রয়গ্রহণ, শত্রুপক্ষ কর্তৃক তাদের বিরুদ্ধে তথাকার খৃস্ট-ধর্মাবলম্বী সম্রাট নাজ্জাশির নিকট ডেপুটেশনে প্রেরণ, অভিযোগ উত্থাপন, নাজ্জাশি কর্তৃক নও-মুসলিমদের আহ্বান, বক্তব্যশ্রবণ ও ইসলামগ্রহণ সংক্রান্ত ঘটনাটি অভিনিবেশসহকারে পাঠ এবং এই খৃস্টান সম্রাটের ইসলাম গ্রহণের কারণটি ভাল করে ভেবে দেখুন।

০ ভেবে দেখুন, সেই থেকে মুসলমানদের বিশেষ কোনও প্রচেষ্টা ছাড়াই অন্যান্য ধর্মাবলম্বী তো বটেই শুধু খৃস্টানধর্মেরই লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ ছাড়াও কত সম্রাট, কত রাজা, কত প্রথিতযশা জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি আজ পর্যন্ত স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে এবং শুধুমাত্র অনাবিল ধর্মীয় আকর্ষণে ইসলামগ্রহণ করেছেন এবং করে চলেছেন।

০ তারপরে ভেবে দেখুন, একমাত্র ইসলামের সত্যতা ছাড়া এঁদের ইসলাম-গ্রহণের অন্য কোনও কারণ আছে কি না এবং থাকতে পারে কি না।

০ অবশেষে ভেবে দেখুন, সুদীর্ঘকাল যাবত গোটা খৃস্টজগতের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা, অপরিমেয় অর্থব্যয় এবং লক্ষ লক্ষ প্রচারকের অক্লান্ত সাধনায় আজ পর্যন্ত অজ্ঞ-অশিক্ষিত, দীন-দরিদ্র এবং সমাজের নিম্নস্তরের অতি নগণ্যসংখ্যক ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বী কোনও সম্রাট, কোনও রাজা বা উল্লেখিত ধরনের

www.icsbook.info

প্রথিতযশা কোনও একজন মানুষও শুধু ধর্মীয় প্রেরণায় খৃস্টধর্মগ্রহণ করেছেন কি না; যদি না করে থাকেন তবে তার কারণ কি?

অতঃপর অতীব লজ্জা এবং দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, বাইবেলে স্ববিরোধী, অবিশ্বাস্য এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত বাণী বর্ণনার তো কোনও অভাব নেই-ই, ওপরন্তু এমন বহু অশ্লীল এবং অশালীন ঘটনারও উল্লেখ রয়েছে যেগুলো উচ্চারণ করতেও জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে পড়ে।

শালীনতাবোধের স্বাভাবিক তাকিদেই ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে যেতে চেয়েছি। কিন্তু ধর্মের ভবিষ্যৎ এবং ধর্মবিরোধী চক্রটির অনিষ্টকারিতার কথা চিন্তা করে তা আর সম্ভব হয়ে উঠল না; অগত্যা যতদূর সম্ভব শালীনতা বজায় রেখে ওধরনের কয়েকটিমাত্র ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা হল :

(ক) বিখ্যাত ধর্মীয় মহাপুরুষ নোয়া (হযরত নূহ্ আ) সম্পর্কে আদিপুস্তক ৯ অ: ২-২৩ পদে যেসব কথা বলা হয়েছে তার সারমর্ম হল : তিনি প্রায়ই মাতাল অবস্থায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে পড়ে থাকতেন আর সেসময় তাঁর পুত্ররা তথায় গমনাগমন করতেন এবং পিতাকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেতেন।

(খ) সুবিখ্যাত বার্তাবাহক মহাপুরুষ ডেভিড (হযরত দাউদ আ) সম্পর্কে বাইবেল ২য় শিমুয়েল ১১ অ: ২১৭ পদে বর্ণিত ঘটনার সারমর্ম হল, তিনি (ডেভিড) বৎসেবা নাম্নী জনৈকা পরমা সুন্দরী রমনীকে স্নানরতা অবস্থায় দর্শন করে ভীষণভাবে কামাশক্ত হন এবং স্বীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য উক্ত রমনীর স্বামীকে কোনও যুদ্ধে পাঠান এবং নিহত করান। পরিশেষে উক্ত রমনীকে নিজের স্ত্রীরূপেগ্রহণ করেন। অথচ এই ডেভিড-এর নিকটেই না কি যাবুর নামক পবিত্র গ্রন্থখানা অবতীর্ণ হয়েছিল!

(গ) লোট (হযরত লুৎ আ) সম্পর্কে বাইবেল, আদিপুস্তক ১৯ অ: ৩০-৩৮ পদে যেঘটনা বর্ণিত রয়েছে তা কলমের সাহায্যে প্রকাশ করা তো দূরের কথা চিন্তা করতেও মন দুঃখ ও লজ্জায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। ইঙ্গিতে শুধু এটুকু বলা যাচ্ছে যে, তিনি নিজেই না কি তাঁর দু'টি কন্যার সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হন এবং তার ফলে উভয়েরই একটি করে সন্তানের জন্ম হয়।

উক্ত সন্তানদ্বয়ের নাম যথাক্রমে মোয়াব এবং বিনম্মি। এরাই না কি মোয়াবী ও আম্মোনীয় সম্প্রদায়দ্বয়ের আদি পিতা।

(ঘ) সলোমন (হযরত সুলাইমান আ)-এর মত মহাপুরুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি পর-স্ত্রীর সাথে প্রেম করতেন, তা ছাড়াও তাঁর না কি তিনশত উপপত্নীও ছিল! — বাইবেল রাজাবলী ১ম অ: ১—৩ পদ

www.icsbook.info

এখানেই এসব জঘন্য ঘটনার ইতি টানছি। তবে সাথে সাথে খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদের স্মৃতিতে একথাটি বিশেষভাবে জাগরূক রাখার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে রাখছি যে, আমরা অর্থাৎ ধার্মিক ব্যক্তিরা ধর্মগ্রন্থের এসব স্ববিরোধিতা, সামঞ্জস্যহীনতা এবং অশ্লীলতা প্রভৃতিকে 'লীলা-সুসমাচার' বা অন্য কিছু আখ্যা দিয়ে ভক্তিতে গদগদ হতে পারি। ওগুলো পাঠ ও শ্রবণের মধ্যে পরিত্রাণ লাভের সুযোগ আবিষ্কার করতে পারি; অমৃতের স্বাদও অনুভব করতে পারি। এমনকি এই স্বাদ অনুভব করার মাধ্যমে অমরত্ব লাভের পুলকও উপভোগ করতে পারি।

কিন্তু ওপরোক্ত ধর্মবিরোধী চক্রটি এই সব 'অমৃতসমান' 'লীলাকাহিনী' থেকেই তীব্র বিষ আহরণ করে ধর্ম এবং তথাকথিত ধর্ম-বিশ্বাস এ উভয়েরই ভবলীলা সাঙ্গ করার কাজ বেশ দক্ষতা এবং সাফল্যের সাথেই চালিয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের উভয়পক্ষের কাজই যদি এমনিভাবে চলতে থাকে তবে সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন এই সব তথাকথিত ধর্ম এবং আমাদের মতো ধার্মীকদের নাম-নিশানাও হয়তো খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে না।

অতঃপর আমার ওয়াদা অনুযায়ী ইঞ্জিল শব্দের বাংলা প্রতিশব্দটি কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে দু'কথা বলতে হচ্ছে। তবে পুস্তকের কলেবর অপ্রত্যাশিতরূপে বেড়ে চলায় এ সম্পর্কে যেসব কথা বলার এবং যেসব তথ্য-প্রমাণাদি তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল তা সম্ভব হয়ে উঠছে না।

ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে ওসব তথ্য-প্রমাণাদি সহকারে পৃথক একখানা পুস্তক লিখার আশা বুকে নিয়ে আপাতত অতি সংক্ষেপে কিছু ইঙ্গিত দিয়েই বিদায় নিতে হচ্ছে। আলোচনার সুবিধার জন্যে 'কেন এ ছলনা?' এই উপ-শিরোনাম দিয়ে বিষয়বস্তু তুলে ধরা হল।

কেন এ ছলনা?

একথা অনস্বীকার্য যে 'সুসংবাদ' এবং 'সুসমাচার' এই শব্দদ্বয়ের মধ্যে বিদ্যমান তাৎপর্যগত পার্থক্য এতই সূক্ষ্ম যে, সাধারণ দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে না।

কিন্তু ইঞ্জিল শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ চয়নের দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন নিশ্চিতরূপেই তাঁরা সাধারণ মানুষ ছিলেন না। সুতরাং এই পার্থক্য যত সূক্ষ্মই হোক তাঁদের চোখে সেটা ধরা না পড়ার সঙ্গত কোনও কারণ থাকতে পারে না।

ইতোপূর্বে তথ্য-প্রমাণাদিসহকারে একথাও বলা হয়েছে যে, যেহেতু ইঞ্জিলের মধ্যে বহুসংখ্যক 'কু' বা 'দুঃখজনক' সমাচার রয়েছে অতএব তার নাম সুসমাচার রাখা শুধু অন্যায় এবং অসঙ্গতই নয়, রীতিমত বিভ্রান্তিকরও।

www.icsbook.info

বিভিন্ন দিক চিন্তা করে এ সম্পর্কে আমি সুনিশ্চিত যে, জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিতভাবেই সুসংবাদ-এর পরিবর্তে সুসমাচার শব্দটি বেছে নেয়া হয়েছিল।

আমার এই সুনিশ্চিত হওয়ার কাজে ইঞ্জিল অবতরণের পটভূমিকা বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। অতএব এ সম্পর্কে ভেবে দেখার জন্যে খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদের উদ্দেশ্যে উক্ত পটভূমিকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে :

০ মাতার সতীত্ব-হীনতা এবং নিজের জারজত্বে মিথ্যা কলঙ্ক, লাঞ্ছনা, অপমান, প্রাণনাশের হুমকি প্রভৃতির মধ্যে কি নিদারুণ অবস্থায় যীশু-জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত হয়েছে সে আভাস ইতোপূর্বে আমরা পেয়েছি।

০ বাইবেলের বর্ণনা সত্য হলে যীশুখৃস্টকে যে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়ক্রমকালে শত্রুহস্তে অতি নির্মমভাবে নিহত হতে হয়েছিল সেকথাও স্বীকার করে নিতে হয়।

০ মেরি এবং যীশু এই অবস্থার জন্য মোটেই দায়ী ছিলেন না। কেননা "যাঁর ইচ্ছা বা আদেশমাত্র সব কিছুই হয়ে যায়" তাঁরই ইচ্ছা বা আদেশে মেরির গর্ভসঞ্চার এবং সেই গর্ভে যীশুর জন্ম হয়েছিল।

০ এ থেকে অনায়াসেই ধরে নেয়া যেতে পারে যে, বিশ্বপ্রভু অর্থাৎ যাঁর ইচ্ছা বা আদেশে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল শুধু সর্বজ্ঞ হিসেবেই নয় ঘটনার সংঘটক হিসেবেও একমাত্র তিনিই মেরি এবং যীশুর নির্দোষিতা সম্পর্কে সম্যক ও সুনিশ্চিতরূপে অবহিত ছিলেন এবং এই নির্দোষিতা প্রমাণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনও একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

০ কাজটি ছিল একান্তরূপেই জটিল ও স্পর্শকাতর। কেননা, এক দিকে বিশ্বপ্রভুর পক্ষে সশরীরে উপস্থিত হয়ে এই নির্দোষিতা প্রমাণ করা যেমন সম্ভব ছিলনা, তেমনই এসব ক্ষেত্রে সাধারণত অভিযুক্তের কোনও কথা, কোনও যুক্তিই অধিকাংশ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না বিধায় মেরি বা যীশুর ওরকম কোনও কথা বা কোনও যুক্তি উত্থাপন করে প্রতিপক্ষের অভিযোগ খণ্ডন এবং নির্দোষিতা প্রমাণ করাও ছিল একান্তরূপেই অসম্ভব।

০ আশাঙ্করি, এ থেকেই অবস্থার জটিলতা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। তবে অবস্থা যত জটিলই হোক, যেহেতু বিশ্বপ্রভুর ইচ্ছা বা আদেশের ফল এমন অন্যায়ভাবে সম্পূর্ণ নির্দোষ দুটি প্রাণীর ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল অতএব এই নির্দোষিতা প্রমাণ করে উভয়কে কলঙ্কমুক্ত করা ছিল বিশ্বপ্রভুর একটি নৈতিক দায়িত্ব।

www.icsbook.info

০ একদিকে এই জটিল পরিস্থিতি আর অন্যদিকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং লাঞ্ছনা-নির্যাতনই নয় বর্তমান এবং অনাগত ভবিষ্যতে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে চিরকলঙ্কিত হয়ে থাকার আশঙ্কায় মেরি এবং যীশু যে কত বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন সেকথা অনুমান করা খুব কঠিন নয়।

০ আর এই কারণে তাঁরা উভয়েই যে অন্তরের সকল নিষ্ঠা, সকল একাগ্রতা এবং সকল ঐকান্তিকতা নিয়ে এই কলঙ্ক অপনোদনের জন্য বিশ্বপ্রভুর উদ্দেশ্য প্রতিটি মুহূর্ত প্রার্থনা করে চলেছিল এবং তাঁদের এই প্রার্থনা মঞ্জুর হল কি না আর হয়ে থাকলে এ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে বা হতে চলেছে এই একটি মাত্র সংবাদ জানার জন্য সর্বোতভাবে উদগ্রীব ও উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষারত ছিলেন সেকথাও সহজেই অনুমেয়।

০ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিশ্বপ্রভুর পক্ষে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে অথবা অভিযুক্তদ্বয়ের মাধ্যমে কোনও কথা বা কোনও যুক্তির অবতারণা করে এই কলঙ্ক অপনোদন সম্ভব ছিল না! এমতাবস্থায় এই কাজের জন্য একটি মাত্র পথই খোলা ছিল। আর তা হল, বিশ্বপ্রভুর পক্ষ থেকে এমন একজন সুযোগ্য প্রতিনিধি আবির্ভূত হওয়া; যাঁর সত্যতা, বিশুদ্ধতা এবং নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহের কোনও অবকাশ না থাকে এবং প্রতিপক্ষের অভিযোগ খণ্ডনেও তিনি যথাযোগ্য ভূমিকা পালনে সক্ষম হন।

০ উল্লেখ্য, বিশ্বপতি কর্তৃক তেমনই এক মহাপুরুষের আবির্ভাব মঞ্জুরির হয়েছিল। এখানে প্রতিধানযোগ্য যে, যীশু-জীবনের ত্রিশটি বছরের সুদীর্ঘ ও উৎকণ্ঠিত প্রতিক্ষার পরে প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ হিসেবে যীশুর কাছে যে ধর্মীয় গ্রন্থখানা অবতীর্ণ হতে যাচ্ছিল তাতে সাধারণভাবে ধর্মসংক্রান্ত যত কথা এবং যত সমাচারই থাকে এই মঞ্জুরির হওয়ার সংবাদটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সুসংবাদরূপে ওতে স্থান পাওয়া যে খুবই স্বাভাবিক ছিল সে সম্পর্কে দ্বিমতের কোনও অবকাশই থাকতে পারে না। আর পরে না বলেই একদিকে গুরুত্বের স্বীকৃতি এবং অন্যদিকে উক্ত সুসংবাদটি যে এই গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে সেকথা সুস্পষ্ট ও ভাস্বর করে তোলার জন্যই গ্রন্থখানার নাম রাখা হয়েছিল 'ইঞ্জিল' অর্থাৎ 'সুসংবাদ'।

০ শুধু মেরি এবং যীশুখৃস্টই নন; অতীতের প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষদের প্রায় সকলের চরিত্রেই যে নানাভাবে নানা কলঙ্ক আরোপ করা হয়েছিল ইতোপূর্বে তথ্য-প্রমাণাদিসহকারে সেকথা তুলে ধরা হয়েছে। স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহল এবং অজ্ঞ ও অতিভক্তেরা যাই করুন আর যাই ভাবুন, তখনও যাঁদের মধ্যে কিছুটা ধর্মভাব জাগ্রত ছিল তাঁরা যে এই জঘন্য ঘটনার জন্য অপরিসীম লজ্জা ও অসহনীয়

www.icsbook.info

বেদনা অনুভব করে চলেছিলেন এবং প্রতিকার-প্রতিবিধানের জন্য বিশ্বপ্রভুর উদ্দেশ্যে কাতরভাবে প্রার্থনা করে চলেছিলেন সেকথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে।

বিশ্বপতির পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে বা হতে চলেছে স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁরা যে সে সুসংবাদটি জানার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে চলেছিলেন সেকথাও অনায়াসে ধরে নেয়া যেতে পারে।

অন্যদিকে বিশ্বপ্রভুর পক্ষ থেকে এহেন জঘন্য কলঙ্ক অপনোদনের ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া এবং কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হল পরবর্তী ঐশী গ্রন্থ হিসেবে এই গ্রন্থখানার মাধ্যমে সে সুসংবাদটি ঘোষিত হওয়া ছিল খুবই স্বাভাবিক। আর হয়েছিলও তা-ই। এ দিক দিয়ে বিচার করলেও গ্রন্থখানার নাম ইঞ্জিল অর্থাৎ সুসংবাদ হওয়াই ছিল সঙ্গত এবং প্রত্যাশিত।

০ ইতোপূর্বে যেসব ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রত্যেকটিতেই এই সুসংবাদটি বিশেষ গুরুত্বসহকারে পরিবেশিত হয়ে এসেছে যে, "শেষ যুগে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটবে আর তিনি হবেন পাপ-বিনাশী এবং ধর্মের পূর্ণতা বিধানকারী।"[১]

উল্লেখ্য, এখানই ছিল সেই সুসংবাদটি ঘোষণার সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ এবং এর মাধ্যমে তা বিশেষ গুরুত্বসহকারে ঘোষণাও করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এদিক দিয়ে চিন্তা করলেও এই গ্রন্থখানার নাম ইঞ্জিল অর্থাৎ সুসংবাদ হওয়াই সঙ্গত ও স্বাভাবিক ছিল বলে বুঝতে পারা যায়।

০ পাপ, দুর্নীতি ও শোষণ জুলুমের মাত্রা সকল সীমা অতিক্রম করে চলায় প্রতিটি ধর্মের মানুষই সেই পাপ-বিনাশী মহাপুরুষের আগমন কবে ঘটবে এই একটি মাত্র সুসংবাদের জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল; আর তা জানিয়ে দেয়া হয়েছিল এই গ্রন্থখানার মাধ্যমেই। সুতরাং ইঞ্জিলই যে এই গ্রন্থখানার যথাযোগ্য নাম এবং 'সুসংবাদ'ই যে ইঞ্জিলের যথাযোগ্য প্রতিশব্দ সে সম্পর্কে আর কোনও সন্দেহ থাকছে না।

ইঞ্জিল শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ যে 'সুসমাচার' নয় বরং 'সুসংবাদ' আশা করি, এই কয়েকটিমাত্র উদাহরণ থেকেই সেকথা বুঝতে পারা যাবে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য অতঃপর উক্ত 'সুসংবাদটি' বাইবেল থেকে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

---

১. Muhammad in world Scriptures এবং ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়ের "বেদে ও পুরাণে হযরত মোহাম্মদ" দ্রং।

www.icsbook.info

I have yet many things to say unto you, but we cannot bear them now. Howbeit when he the spirit of truth is come, he will guide you into all truth, for, he shall not speak of himself, but what soever he shall hear, that shall he speak; and he will show you things to come. He shall glorify me. John 16 : 12-14

অর্থাৎ তোমাদের কাছে এখনও আমার বহু কথাই বলিবার রহিয়াছে। কিন্তু এখন সেগুলোকে তোমরা সহ্য করিতে পারিবে না। যাহা হউক, যখন সেই সত্যের আত্মা আবির্ভূত হইবেন, তিনি তোমাদিগকে সত্যের পথে পরিচালিত করিবেন। কেননা, তিনি নিজ হইতে কোনও কথা বলিবেন না— (বিশ্বপ্রভুর নিকট হইতে) যাহা তিনি শ্রুত হইবেন তাহাই তিনি বলিবেন। ঘটিতব্য বিষয় সমূহও তিনি তোমাদিগকে প্রদর্শন করিবেন। (এবং) তিনি আমাকে কলঙ্কমুক্ত করিবেন। — যোহন ১৬ অঃ ১২-১৪ পদ

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আসল ইঞ্জিলে এই সুসংবাদটি কিভাবে লিখিত ছিল এবং তাতে কি কি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল সেকথা জানার কোনও উপায়ই আজ আর নাই।

বাইবেলের ইংরেজে অনুবাদের কোনও কোনওটিতে এই আগন্তুক মহাপুরুষকে 'Paraclet' এবং কোনও কোনওটিতে Comforter বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাইবেল নতুন নিয়মে Periklutos শব্দটি বিদ্যমান ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। অনুবাদক কর্তৃক যার কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে Parakeldtos বানানো হয়েছে। এর বঙ্গানুবাদ করতে গিয়ে কেউবা 'সহায়' আবার কেউবা 'শান্তি-দাতা' শব্দসমূহ প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, বাইবেল নতুন নিয়মের আরও কতিপয় স্থানে এই সুসংবাদটি কিছুটা ভিন্নভাবে পুনরুক্ত হয়েছে।

তওরাত এবং আল্লোপনিষদে 'মুহম্মদ' শব্দটি আজও অবিকলভাবে বিদ্যমান রয়েছে, যদিও ব্যাখ্যাতা ও ভাষ্যকারদের অনেকে নিজেদের ইচ্ছামত তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। হিব্রু তাওরাতে মুহাম্মদ-এর পরিবর্তে 'মুহম্মদিম' লিখিত থাকতে দেখা যায়। অবশ্য ব্যাকরণ অনুযায়ী মুহম্মদিম-এর তাৎপর্য যে 'সম্মানিত মুহম্মদ' (স) বিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর অনেকেই বিশ্লেষণ দ্বারা সেকথা প্রমাণ করেছেন।

বাইবেলের কোনও কোনও টীকাকার সুস্পষ্টভাবেই একথা উল্লেখ করেছেন যে 'মুহম্মদ'-এর আবির্ভাবে যীশুখৃস্টের ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়েছে।

www.icsbook.info

প্রাথমিক যুগে বাইবেলের আরবি অনুবাদে 'আহমদ' শব্দটি বিদ্যমান থাকার সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। ১৮২৬ খৃস্টাব্দে পাদ্রী সেল সাহেবের সাহায্যে এই শব্দটিকে যে খৃস্টানদের অনুকূলে বদলিয়ে দেয়া হয়েছে Mr. William muir তাঁর প্রণীত Life of Mohammed নামক পুস্তকে সুস্পষ্টভাবে সেকথা স্বীকার করেছেন।[১]

"কল্ক অর্থ পাপ।" আর কল্কী অর্থ 'পাপবিনাশী'। কলিযুগের শেষ পৃথিবী যখন পাপে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে তখন সেই পাপবিনাশের জন্য কল্কী (পাপবিনাশী)-র আবির্ভাব ঘটবে বলে কল্কীপুরাণে লিখিত রয়েছে। কলির শেষে আগমনকারী এবং পাপবিনাশী এই ব্যক্তি যে হযরত মুহাম্মদ (স) ব্যতীত আর কেউ নয় সেকথা বলাই বাহুল্য।

নামের প্রথম অক্ষর 'ম' এবং শেষ অক্ষর 'দ' এইরূপ নাম বিশিষ্ট বৃষ ভক্ষণকারী জনৈক দেবতার আবির্ভাব সম্পর্কে সামবেদে উল্লেখ থাকতে দেখা যায়। এইরূপ নাম বিশিষ্ট এবং বৃষ ভক্ষণকারী দেবতা যে কে সেকথা খুলে বলার কোনও প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না।

মহাভারতে বলা হয়েছে, "চারিখানা বেদের পরস্পরের শিক্ষা ভিন্ন ভিন্ন, স্মৃতিশাস্ত্রগুলোর অবস্থাও তদ্রূপ, মুনি-ঋষিদিগের পরস্পরের মতও অভিন্ন নয়" উক্ত শ্লোকের পরবর্তী পংক্তিটি হল : "ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়ং" অর্থাৎ— ধর্মের তত্ত্ব পর্বতগুহায় নিহিত রয়েছে। এখানে প্রশ্ন হল— সেটি কোন্ পর্বতের গুহা এবং কে সেই মহাপুরুষ যিনি পর্বতগুহায় সিদ্ধিলাভ করে ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব লাভে সক্ষম হয়েছিলেন?

এই প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তরই রয়েছে। আর তা হল : সেই পর্বতের নাম 'জবলেনুর'; গুহার নাম 'হেরা' এবং মহাপুরুষটির নাম— 'হযরত মুহাম্মদ (স)।'

উদাহরণের সংখ্যা আর না বাড়িয়ে অতঃপর শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি যে, পৃথিবীর বিশ্বস্ত ধর্মগ্রন্থসমূহের প্রত্যেকটিতে কোনও না কোনও ভাবে এই মহাপুরুষের আগমন সংক্রান্ত সংবাদটি আদিম জামানা থেকে ঘোষিত হয়ে এসেছে। আর যীশুখৃস্টের কাছে অবতীর্ণ গ্রন্থখানাই ছিল এই সংবাদটি ঘোষণার শেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সুতরাং তার নামকরণও তদনুযায়ী হওয়াই ছিল সঙ্গত ও স্বাভাবিক। এদিক দিয়ে বিচার করলেও ইঞ্জিল শব্দের অর্থ যে সুসমাচার নয় বরং 'সুসংবাদ' সেকথা না বলে উপায় থাকে না।

---

১. ১ অঃ ৫ম পৃঃ (১৯২৩) দ্রষ্টব্য

www.icsbook.info

তাছাড়া ধর্মগ্রন্থে সাধারণত থাকে 'তত্ত্বকথা' এবং ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানাদি কিভাবে সম্পন্ন করতে হবে সেসব 'সমাচার' আর কারও আগমন সংক্রান্ত বাক্যকে সকল দেশেই বার্তা বা 'সংবাদ' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এবং উক্ত আগন্তুক সমাগত হয়ে যেসব কার্য সম্পাদন করেন সে সবের বর্ণনা বিবরণকেই সাধারণত সমাচার বলে অভিহিত করার রীতি প্রচলিত রয়েছে!

পরিশেষে প্রসঙ্গের উপসংহার হিসেবে বলা যাচ্ছে যে, ইঞ্জিলে বিভিন্ন তত্ত্বকথা এবং ধর্মীয় সমাচার তো রয়েছেই, তদুপরি এই সুসংবাদটিও রয়েছে। এই থাকার কথা এবং সুসংবাদটির গুরুত্ব সার্থকভাবে তুলে ধরার জন্যই এর নাম দেয়া হয়েছিল 'ইঞ্জিল' বা 'সুসংবাদ'।

যে প্রশ্নটির উত্তর না দিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে অতঃপর সেটিকে তুলে ধরতে হচ্ছে। প্রশ্নটি হল : ইঞ্জিলের বাংলা প্রতিশব্দ চয়নকারী পণ্ডিত ব্যক্তিরা যে 'সুসংবাদ' এবং 'সুসমাচার'-এর মধ্যে বিদ্যমান এসব পার্থক্যের কথা জানতেন না কোনওক্রমেই সেকথা মেনে নেয়া যায় না। এমতাবস্থায় প্রশ্ন হল, জেনেশুনেও তাঁরা সুসংবাদের পরিবর্তে সুসমাচারকে কেন গ্রহণ করেছিলেন?

এই প্রশ্নের সোজা উত্তর হল, জনগণ বিশেষ করে খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে উল্লেখিত সুসংবাদটি থেকে তাঁদের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরায়ে রাখার উদ্দেশ্যেই সুপরিকল্পিতভাবে তাঁরা এ কাজ করেছিলেন।

কারণ বাংলা বাইবেলের নাম সুসংবাদ রাখা হলে মানুষ স্বভাবতই অনুসন্ধিৎসু হয়ে গোটা গ্রন্থখানার মধ্যে 'সুসংবাদ' কোনটি বা কোনটি সুসংবাদ হওয়ার যোগ্য তা খুঁজে বের করবে এবং হযরত মুহম্মদ (স) ও তাঁর প্রচারিত ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে এমন একটা ধারণা তাঁরা করে নিয়েছিলেন।

পক্ষান্তরে 'সুসমাচার' রাখা হলে গোটা গ্রন্থের যাবতীয় বাণী-বর্ণনাগুলোই যে সুসমাচার বলে চালিয়ে দেয়া ছাড়াও সু-সংবাদটির গুরুত্ব লাঘব করা এমনকি তার অস্তিত্বই যে গোপন করে ফেলা সহজ ও সম্ভব হবে এমন একটা ধারণাও উক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মন-মগজে দানা বেঁধে উঠেছিল। আর এটাই ছিল সুসংবাদের পরিবর্তে সুসমাচার শব্দটিকে গ্রহণ করার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এর পরও প্রশ্ন থেকে যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি তাঁদের এই বিদ্বেষের কারণ কি? আর কেনইবা তাঁরা ইঞ্জিল ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত এই সুসংবাদটি সরলভাবে গ্রহণ করেননি?

এই প্রশ্নের উত্তর হল : প্রতিটি ধর্মের মানুষই এ ধারণা পোষণ করে চলেছিলেন যে, আজও প্রতিশ্রুত মহাপুরুষটির আবির্ভাব ঘটেনি এবং নিশ্চিতরূপে তিনি আমাদের মাঝেই আবির্ভূত হবেন।

www.icsbook.info

কিন্তু যখন দেখা গেল যে, তিনি তাদের কারও মধ্যে আবির্ভূত না হয়ে মক্কার কোরাইশবংশে আবির্ভূত হলেন তখন সকলেই ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত ও হতাশ হয়ে তাঁর বিরোধিতায় মেতে ওঠেন।

কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে, যেহেতু বাইবেলসহ সবগুলো ধর্মগ্রন্থেরই ছাটকাট এবং রদ-বদল করা হয়েছে, এমতাবস্থায় উক্ত সুসংবাদটিও তো তারা অনায়াসে নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ থেকে বাদ দিতে পারতেন; ফলে সব ল্যাঠাই চুকে যেতো।

তাঁদের এই প্রশ্নের উত্তর হলো : নানাভাবে উক্ত নামটির কদর্থ করার চেষ্টা যে করা হয়েছে এবং হয়ে চলেছে ইতোপূর্বে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি এবং আজও পেয়ে চলেছি। গোটা সুসংবাদটি বাদ না দেয়ার কারণ হলো : এতদ্বারা তাঁরা একথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, মুহাম্মদ (স) তো প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ ননই এমনকি তিনি মহাপুরুষই নন। আসলে এখনও প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আবির্ভাবই ঘটেনি এবং যখন ঘটবে তখন নিশ্চিতরূপে তা ঘটবে আমাদেরই মাঝে।

ভবিষ্যৎ বাণীটি কিভাবে সফল হলো

এবারে আর একটি কথা বলেই প্রসঙ্গের ইতি টানছি। কথাটি হলো : ইতোপূর্বে বাইবেল থেকে উদ্ধৃত বাণীটিতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, হযরত মুহম্মদ[১] (স) মেরি এবং যীশুকে কলঙ্কমুক্ত করবেন বলে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন জানা প্রয়োজন যে, বাইবেলের এই ভবিষ্যৎ বাণী সফল হয়েছে কি না। আর হয়ে থাকলে কিভাবে তা হয়েছে।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের পাঠকমাত্রই অবহিত রয়েছেন যে, শুধু মেরি এবং যীশুই নন, বিশ্বের প্রত্যাদিষ্ট সকল মহাপুরুষকেই সত্য, শুদ্ধ এবং নিষ্পাপ বলে পবিত্র কুরআন পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেছে। শুধু তা-ই নয়, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস পোষণ এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপনকে প্রতিটি মুসলমানের জন্য ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ বলেও বিধিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এ কাজ করা না হলে কেউ মুসলমান বলে গণ্যই হতে পারে না।

---

১. বেদ অনুসারী তিনি নরাশংস, ভবিষ্য পুরাণের মতে তিনি অন্তিম ঋষি বা অন্তিম অবতার। কল্কিপুরাণানুযায়ী তাঁর নাম কল্কি অবতার বা পাপ বিনাশী; বাইবেল অনুযায়ী তিনি কমফোর্টার বা শান্তি-দাতা। বৌদ্ধধর্মগ্রন্থে তিনি মৈত্রেয়। ড. বেদপ্রকাশ উপধায় এম, এ (রিসার্চ স্কলার, সংস্কৃত বিভাগ প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়) কর্তৃক প্রণীত 'বেদ-পুরাণে হযরত মুহম্মদ' পুস্তক দ্রষ্টব্য।

www.icsbook.info

পবিত্র কুরআনের পাঠক মাত্রেরই একথাও জানা রয়েছে যে, মেরির সতী-সাধ্বি এবং বিশুদ্ধ চরিত্রের অধিকারিণী হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বহু স্থানেই নানা ধরনের যুক্তির অবতারণা করা ছাড়াও 'সুরা মরিয়ম' নামে সম্পূর্ণ একটি সুরা পবিত্র কুরআনে সন্নিবেশ করে তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়েছে। তাছাড়া পবিত্র কুরআনের দু'চারটি পৃষ্ঠার পরে পরেই মেরি এবং যীশুখৃস্টের প্রশংসা সূচক বাণীরও উল্লেখ থাকতে দেখা যায়।

শুধু একথা বলেই বলা শেষ হয়ে যায় না। এখানে বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে, প্রতিটি ধর্মেরই এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষ হযরত মুহাম্মদ (স)-কে মুখের ভাষায়, পুথি-পুস্তকের মাধ্যমে এমনকি দৈহিকভাবে আক্রমণ করতেও কোনও ত্রুটি করেনি। অথচ এমনভাবে আক্রান্ত এবং নাজেহাল হওয়ার পরও তিনি উদাত্ত কণ্ঠে আক্রমণকারীদের মধ্যে আবির্ভূত মহাপুরুষদের প্রশংসা করেছেন। নানাভাবে তাঁদের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেছেন। তাঁদের সম্মান হানি হতে পারে সারাজীবনে এমন একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি।

বরং বিশ্ববাসীর কাছে তিনি নানাভাবে একথাই তুলে ধরেছেন যে, 'বিশ্বের প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষেরা কেউ পরস্পর থেকে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন নন। কেননা আবহমানকাল ধরে তাঁরা এক একজন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে অথবা একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইসলামের মহান শিক্ষারই প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।'

"অতএব সকলেই আল্লাহর মনোনীত মহাপুরুষ এবং ইসলামের বাহক ও প্রতিষ্ঠাতা। আর নানা কারণে সেই ইসলামের মধ্যে যেসব আবিলতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, আমাকে পাঠানো হয়েছে ইসলামকে সেই সব আবিলতা থেকে মুক্ত, প্রাণবন্ত ও পরিপূর্ণ করে তুলতে।"

এ সম্পর্কে তাঁর পবিত্র মুখ-নিসৃত একটি বাণী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সে বাণীটি হল, "একটি অতি মূল্যবান হার গাঁথার কাজ চলছিল। একটি মাত্র দানার জন্য হারটি অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল। সেই দানাটিই আমি আমার সংযোজন দ্বারা হার গাঁথার কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে।"

বলাবাহুল্য, এতদ্বারা তিনি বিশ্বের সকল প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষকে শুধু একই সূত্রে গ্রথিত করেননি, সকলকে সমমর্যাদার অধিকারী পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ ও অচ্ছেদ্য সম্পর্কসম্পন্ন প্রত্যেকের বিদ্যমানতাকে অপরিহার্য বলেও ঘোষণা করেছেন।

এ কারণেই এক মহাপুরুষের অনুসারী কর্তৃক অন্য মহাপুরুষকে ভিন্ন ও হেয় মনে করা এবং নিন্দা প্রচারকে তিনি ধর্ম ও নীতিবহির্ভূত অতি জঘন্য কাজ

www.icsbook.info

বলে ঘোষণা করে প্রতিটি মুসলমানকে সর্বপ্রযত্নে তা থেকে বিরত থাকার জন্যে পুনঃ পুনঃ নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এমন জঘন্য কাজের অনুষ্ঠাতা যে মুসলমান পদবাচ্য হতে পারে না দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সেকথাও ঘোষণা করেছেন।

তাঁর অনুসারীগণ যে অতীব নিষ্ঠার সাথে এই নির্দেশ মেনে চলছে এবং চিরদিনই চলতে থাকবে তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ হলো, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বনবী (স) ও ইসলামের প্রতি যেসব অত্যাচার-অবিচার করেছে এবং করে চলেছে একথা অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে জানা থাকার পরও বিশ্বের অন্তত ১০০ কোটি মুসলমান মেরি, যীশুখৃস্ট এবং অন্যান্য যেসব মহাপুরুষের চরিত্রে জঘন্য কলঙ্ক আরোপ করা হয়েছে তাঁদেরসহ বিশ্বের সত্যদ্রষ্টা সকল মহাপুরুষকে শুধু অন্তরের সাথে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেই চলছে না বরং নিজেদের মুখের কথা, আলাপ-আলোচনা, বই-পুস্তক, বক্তৃতা-বিবৃতি এবং ওয়াজ-নছিহতের মাধ্যমে তাঁদের সত্যতা, বিশুদ্ধতা এবং মহাপুরুষত্বের কথা বিশ্বব্যাপী প্রচার করাকে অন্যতম কর্তব্য হিসেবে পালন করে চলেছে।

বাইবেলের ওপরোক্ত ভবিষ্যৎ বাণীটি অর্থাৎ সাধারণভাবে বিশ্বের প্রত্যাদিষ্ট সকল মহাপুরুষ এবং বিশেষভাবে মেরি ও যীশুখৃস্টকে কলঙ্কমুক্ত করার কাজটি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর দ্বারা সফল হয়েছে কি না এবং তিনিই সেই ভবিষ্যৎ বাণীতে উল্লেখিত মহাপুরুষ কি না এবং অতীতের এক শ্রেণীর পাদ্রী-পুরোহিত লোকদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে ছলনামূলকভাবে ইঞ্জিলের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'সুসংবাদ'-এর পরিবর্তে 'সুসমাচার'কে বেছে নিয়েছিলেন কি না, আশা করি খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিরা ওপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে তা অবশ্য বুঝতে পারবেন।

খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদের মধ্যে জ্ঞানী, চিন্তাশীল, স্থিরপ্রাজ্ঞ এবং অনুসন্ধিৎসু মানুষের কোনও অভাব নেই। অতএব আমার দৃঢ়বিশ্বাস রয়েছে যে তাঁরা যদি ওপরের এই আলোচনাটি নিয়ে ভাল করে ভেবে দেখেন তাহলে তাঁরা অবশ্যই স্বীকার না করে পারবেন না যে, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর দ্বারা বাইবেলের ওপরোক্ত ভবিষ্যৎ বাণীটি যথার্থরূপেই সফল হয়েছে এবং তিনিই সেই আকাঙ্ক্ষিত মহাপুরুষ।

তাছাড়া তিনি যে বিশ্বনবী এবং ইসলাম যে বিশ্বধর্ম সেকথাও এ থেকে তাঁরা বুঝতে পারবেন বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস রয়েছে।

ইসলাম যে সর্বজনীন তথা 'বিশ্বধর্ম' এবং শূদ্র-ভদ্র নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষেরই যে এতে প্রবেশাধিকার এবং সত্যিকারের ধর্মীয় জীবন গড়ে তোলার পরিপূর্ণ সুযোগ রয়েছে সে সম্পর্কে আমার খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদের সুনিশ্চিতকরণের জন্য একটি মাত্র উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে।

www.icsbook.info

কোনও ধর্মকে সত্য বলে জানা এবং তার সাহায্যে নিজেকে সত্যিকারের ধার্মিকরূপে গড়ে তোলার মহান উদ্দেশ্য নিয়েই যে এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্ম-গ্রহণ করে থাকেন অন্তত তাই যে স্বাভাবিক সেকথা খুলে বলার কোনও প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না।

যিনি ধর্মের প্রেরণা এবং উন্নত জীবন লাভের আকুলতায় নিজের সহায়-সম্পদ, স্বজন-পরিজন প্রভৃতি সবকিছুকে পরিত্যাগ করেন তিনি যে নিষ্পাপ হয়ে এক নব-জীবন লাভ করেন সে সম্পর্কেও কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না।

যেহেতু নানা কারণে বা যেকোনও কারণে সাধারণত অন্যদের পক্ষে এ ধরনের ত্যাগ স্বীকার সম্ভব হয়ে ওঠে না অতএব এইসব ত্যাগী ব্যক্তিদের অনন্যসাধারণ বলা হলে সেটা যে অন্যায় বা অতিশয়োক্তি হতে পরে না সে কথাও সহজেই অনুমেয়। ওপরের এসব কারণসমূহ নিয়ে বিচার-বিবেচনা করা হলে নব-দীক্ষিতেরা যে ধার্মিক অন্তত ধর্মভীরু সেকথা বেশ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর ধার্মিক ব্যক্তিরা যে সম্মানিত, অন্তত সম্মান পাওয়ার যোগ্য আবহমানকাল ধরে সেকথা আমরা জেনে এসেছি।

অথচ আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, নবদীক্ষিত খৃস্টানেরা আদি খৃস্টানদের দ্বারা নানাভাবে উপেক্ষিত হয়ে থাকেন। তাঁদের সম্মানের অধিকারী তো নয়ই এমনকি সম-অধিকারী বলেও মনে করা হয় না।

তাছাড়া তথাকথিত আদি ও অভিজাত খৃস্টানদের উপাসনালয়, স্কুল, কলেজ, খানার মজলিস, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির কোনওটাতে প্রবেশাধিকার পর্যন্ত তাদের দেয়া হয় না। উন্নত-জীবন লাভের যে প্রেরণা নিয়ে তাঁরা সর্বস্ব ত্যাগ করেন তেমন জীবন লাভের কোনও সুযোগও তাঁদের দেয়া হয় না।

নবদীক্ষত হিন্দুদের অবস্থা এঁদের চেয়েও শোচনীয়। কেননা, প্রথমত হিন্দুধর্মানুযায়ী অন্য ধর্মের মানুষকে দীক্ষা দানের কোনও ব্যবস্থা নেই। তাঁদের দৃষ্টিতে তাঁরা ব্যতীত বিশ্বের সকল মানুষই ম্লেচ্ছ, অসুর, বানর, রাক্ষস প্রভৃতি। আর্যসমাজে অধুনা দীক্ষাদানের ব্যবস্থা অবলম্বিত হলেও নিজ নিজ ধর্মে থাকাকালীন এইসব নব-দীক্ষিত যত উচ্চস্তরেই থাকুন না কেন, হিন্দুধর্ম-গ্রহণের সাথে সাথে তাঁদের হরিজন বা অচ্ছুৎদের শ্রেণীভুক্ত হতে হয়।

যেহেতু ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেউ পূজার্চনার অধিকারী নয়, আর যেহেতু নবদীক্ষিতেরা ব্রাহ্মণ হতে পারে না এবং সে সুযোগ পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই

www.icsbook.info

নেই, অতএব পৈত্রিক ধর্মে থাকাকালীন উপাসনা-আরাধনার যত সুযোগই তাঁরা পেয়ে থাকুন এখানে এসে তার কণামাত্র সুযোগও তাঁরা পান না, ধর্মীয় বিধানানুযায়ীই পেতে পারেন না পাওয়া সম্ভবই নয়।

ফলে উন্নতর ধর্মীয় জীবন লাভের গভীর আকুলতা নিয়ে এবং সবকিছু বিসর্জন দিয়ে এখানে এসে তাঁদের ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান, মান-সম্মান প্রভৃতি সবকিছু থেকে বঞ্চিত হতে হয়। শুধু তা-ই নয়, অচ্ছুৎ হিসেবে বংশানুক্রমিকভাবে বর্ণ-হিন্দুদের কাছে অবহেলা ও ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়ে জীবন কাটাতে হয়।

পক্ষান্তরে নব-দীক্ষিত মুসলমানদের এসব কোনও সমস্যারই সম্মুখীন হতে হয় না। তাঁরা মুচি, মেথর, ডোম, চারাল, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চাষী, ভদ্র, নিগ্রো, কাফ্রি প্রভৃতির যাই হোন, ইসলামগ্রহণের সাথে সাথে তাঁরা শুধু নতুন জীবন এবং নতুন নামই লাভ করেন না, নতুন পরিচয়ও লাভ করেন।

অর্থাৎ অতীতে তাঁরা মর্যাদাবান-অমর্যাদাবান প্রভৃতি যা কিছুই থেকে থাকুন, এখানে এসে তাঁদের আর সে পরিচয় থাকে না। অতীতের সবকিছু ধুয়ে মুছে গিয়ে নতুন নামের সাথে সাথে নতুন পরিচয়ও তাঁদের শুরু হয়ে যায়। তখন তাঁরা মুসলমান, সুতরাং বিশ্বমুসলিমের সাথে একাকার, অভিন্ন এবং অবিচ্ছেদ্য।

অতীত জীবনে ধর্ম-কর্মাদি অনুষ্ঠানের কোনও সুযোগ এবং অধিকার তাঁরা পেয়ে থাকুন অথবা না পেয়ে থাকুন, ইসলামগ্রহণের সাথে সাথে সে সুযোগ এবং অধিকার তাঁরা পূর্ণমাত্রায়ই পেয়ে যান। শুধু তাই নয় অন্যান্য মুসলমানদের মতো তাঁদের ওপরও যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে উন্নতর ধর্মীয় জীবন গড়ে তোলার যে আশা এবং আগ্রহ নিয়ে তাঁরা ধর্মান্তরগ্রহণ করেন, সে আশা এবং আগ্রহ পূরণের সকল সুযোগই তাঁদের করায়ত্ব হয়ে থাকে।

সকলের চোখের সম্মুখে বিদ্যমান এসব বাস্তব উদাহরণ ছাড়াও কৃষ্ণকায় কাফ্রি এবং এককালের ক্রীতদাস হযরত বেলাল (রা) এবং এমনি আর অনেকের 'সাহাবী'র পদমর্যাদা লাভ প্রভৃতি বহু উদাহরণই ইতিহাসের পাতা থেকে টেনে আনা যেতে পারে।

ইসলামই যে সর্বজনীন তথা বিশ্বধর্ম এবং হযরত মুহাম্মদ (স) যে বিশ্বনবী এবং গোটা বিশ্বের জন্যে আল্লাহর রহমতস্বরূপ জানিনা সে সম্পর্কে এর চেয়ে আর অকাট্য প্রমাণ কি থাকতে পারে।

www.icsbook.info

এক যাত্রায় ভিন্ন ফল

সাধারণত এক যাত্রায় ভিন্ন ফল হওয়ার কথা নয়, অথচ কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা হতে দেখা যায়। আর দেখা যায় বলেই কথাটি প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। কি কারণে এবং কিভাবে এক যাত্রায় ভিন্ন ফল হয়ে থাকে সে সম্পর্কীয় আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ভাল করে ভেবে দেখার জন্য আমার খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা যাচ্ছে।

নানা কারণে পৈত্রিক ধর্মের প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি হওয়ার পর যখন গ্রহণযোগ্য কোনও ধর্মের সন্ধানে রয়েছি সেসময় জনৈক খৃস্টান বন্ধুর পরামর্শে তদানীন্তন কালে কলকাতার ইন্টালি এলাকায় বসবাসকারী রেভারেন্ড জন ফেইতফুল সাহেবের সাথে সাক্ষাত করি।

তিনি আমার মনের কথা জেনে নিয়ে সরাসরি আমাকে খৃস্টাধর্মগ্রহণ করতে বলেন। এ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যেসব কথা হয়েছিল স্থানাভাববশত এখানে সেগুলো তুলে ধরা সম্ভব নয়। তার প্রয়োজনও নেই। অতএব শুধু সারমর্মটুকু তুলে ধরা যাচ্ছে।

চিরাচরিত প্রথায় অন্যান্য খৃস্টানদের মতো তিনিও আমার কাছে ত্রিত্ববাদ এবং প্রায়শ্চিত্তবাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। যীশুখৃস্ট যে ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্র, অন্যতম ঈশ্বর এবং ত্রাণকর্তা, আর তাঁর প্রতি বিশ্বাস করা ছাড়া বিশ্ববাসীর জন্য ত্রাণ লাভের বিকল্প কোনও পথই যে আর নেই নানাভাবে আমাকে সেকথা বোঝানোর চেষ্টাও তিনি করেন।

প্রায়শ্চিত্তবাদ সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন তার সারমর্ম হল : যেহেতু ত্রাণকর্তা হিসেবে বিশ্বের সকল মানুষের যাবতীয় পাপের জন্য সকলের পক্ষ থেকে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যীশুখৃস্ট ক্রুশ-বিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে গেছেন, অতএব মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য নিজ নিজ পাপমোচনের এই সুবর্ণ সুযোগটিগ্রহণ করা।

কিভাবে এই সুযোগগ্রহণ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন; "যীশুখৃস্ট যে ত্রাণকর্তা এবং তিনি যে সকলের পক্ষ থেকে যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন সেকথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে যীশু এবং তাঁর প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান এই উভয়ের সাথে নিজেকে সংশ্লিষ্ট না করা পর্যন্ত এ সুযোগ লাভ সম্ভব নয়।

অতএব কোনও ব্যক্তি, সে যত বড় পাপীই হোক না কেন, ওপরোক্তরূপে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে যীশু এবং তার প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের সাথে নিজেকে সংশ্লিষ্ট

www.icsbook.info

করা মাত্রই যাবতীয় পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। ফলে তাঁকে আর কৃত-কর্মের হিসেব-নিকেশ, শাস্তিভোগ প্রভৃতি কোনও কিছুরই সম্মুখীন হতে হয় না।

পক্ষান্তরে ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য আমি যখন খানবাহাদুর আলহাজ্জ আহসান উল্লাহ্ এবং মওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁ প্রমুখের সাথে আলোচনা করেছিলাম তখন তাঁদের একজনও সরাসরিভাবে আমাকে ইসলামগ্রহণের কথা বলেননি, বরং একদিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে, ইসলামগ্রহণের ফলে যে কঠোর সাধনা ও নিয়মানুবর্তিতার সম্মুখীন হতে হয় তার বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ইসলামগ্রহণ সম্পর্কে আমার মনে ভীতি এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বেরই সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন।

ইসলাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁরা প্রত্যেকে যে-কথাটির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তা এই ছিল যে, বিশ্বের যিনি স্রষ্টা তিনি শুধু স্রষ্টাই নন, প্রভু এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীও। আর আদেশ বা নির্দেশ দানের অধিকার যে একমাত্র প্রভুরই থাকে সেকথাও সর্বজনবিদিত এবং সর্বস্বীকৃত।

আর নির্দেশ মানা বা অমান্যকারীদের বিচার করা, ক্ষমা করা, শাস্তি এবং পুরস্কার দানের যোগ্যতা এবং অধিকারও যে একমাত্র প্রভুরই থাকে এবং তাই যে স্বাভাবিক সেকথাও খুলে বলার কোনও প্রয়োজন হয় না।

মোটকথা, তাঁরা আমার কাছে ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য বেশ প্রাঞ্জল ও বোধগম্যভাবে তুলে ধরে ছিলেন। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে অতঃপর খৃস্টধর্ম ও ইসলাম এ দুটি ধর্মের ধর্মীয় দর্শনকে পাশাপাশি রেখে বিচার-বিবেচনা করা হলেই এই এক যাত্রায় ভিন্ন ফল কেন এবং কিভাবে হয়ে থাকে সেকথা বুঝতে পারা যাবে বলে আশা করি।

খৃস্টীয় ধর্মের ভিত্তি যে ত্রিত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেকথা সকলেরই জানা রয়েছে। আর ত্রিত্ববাদের সারকথা যে পিতা (স্বয়ং ঈশ্বর), পুত্র (যীশুখৃস্ট) এবং পবিত্রাত্মা (গেব্রীয়েল) এই তিন জন স্বতন্ত্র ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন সেকথাও কারও অজানা নয়।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, যীশুখৃস্ট শুধু তিন-এর তৃতীয় বা অন্যতম ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্রই নন, তিনি ত্রাণকর্তাও।

এ ত্রিত্ববাদেরই একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল প্রায়শ্চিত্তবাদ বা Doctrine of Atonement অর্থাৎ "যীশুখৃস্ট বিশ্বজগতের যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে গেছেন এবং তাঁর এই পবিত্র রক্তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনমাত্রই বিশ্বাস স্থাপনকারীর জীবনের যাবতীয় পাপ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, ফলে

www.icsbook.info

তার জন্যে পারলৌকিক জীবনে কোনওরূপ ।হসেব-।নকেশ বা শাস্তির প্রশ্নই থাকে না, এই কথার ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনই হল প্রায়শ্চিত্তবাদের মূলকথা।

এতদ্বারা যে বিষয়গুলো বেশ সুস্পষ্ট হয় উঠছে তা হল :

০ বিশ্বপ্রভু ছাড়াও দু'জন স্বতন্ত্র এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণ ঈশ্বর রয়েছেন এবং এই তিনজনের প্রতিই সমভাবে বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য। অথচ এটা কোনওক্রমেই সম্ভব নয়। তাছাড়া বাইবেলের বর্ণনায় প্রকাশ যীশুখৃস্ট বলেছেন, "তোমরা একই সাথে ঈশ্বর এবং ধন এ উভয়কে ভালবাসতে পার না। কেননা, তা হলে কোনও সময় ধনের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে ঈশ্বরের প্রতি অবহেলার সৃষ্টি হতে পারে।" অতএব তিন জনের প্রতি সমভাবে বিশ্বাস পোষণ যে শুধু অসম্ভবই নয়, যীশুখৃস্টের শিক্ষারও পরিপন্থি সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

০ সদাপ্রভু বা আসল ঈশ্বর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নন। কেননা মানুষের ত্রাণ করার কোনও অধিকারই তাঁর নেই, এ অধিকার একান্তরূপেই যীশুখৃস্টের করায়ত্ব। অথচ ত্রাণ বা যেকোনও এক বা একাধিক ক্ষমতা থেকে যিনি বঞ্চিত তাঁকে কোনওক্রমেই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা যেতে পারে না।

০ এভাবে ত্রাণের কর্তৃত্ব হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ফলে বিচারের কর্তৃত্বও যে বিশ্বপ্রভুর হাতছাড়া হয়ে গেছে সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা, বিচারের কর্তা যিনি অপরাধীকে শাস্তি দান, ত্রাণ, রেহাই বা ক্ষমা করা, পুরস্কার প্রদান প্রভৃতি ক্ষমতা এবং অধিকারও একমাত্র তাঁরই থাকতে পারে; এবং তাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও একথা বলে যে, বিচার এবং ত্রাণের কর্তা ভিন্ন হলে বিচারক অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করবেন আর ত্রাণকর্তা বিনা বিচারে তাকে ছেড়ে দেবেন, অন্তত বিচারের কাজ এভাবে চলতে পারে না। অন্যদিকে যেহেতু যীশুখৃস্ট বিশ্বের যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন আর যেহেতু এই প্রায়শ্চিত্তবাদের সুযোগে অন্তত খৃস্টীয় জগতের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের অসংখ্য-অগণিত মানুষ পাপমুক্ত হওয়ার ফলে তাদের আর বিচারের সম্মুখীনই হতে হচ্ছে না, এমতাবস্থায় বিশ্বপ্রভু যে অন্তত খৃস্ট-জগতের বিচারকর্তা নন সেকথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ খৃস্টীয় জগতের কাছে বিশ্বপ্রভু আর যা কিছুরই কর্তা বলে বিবেচিত হোন না কেন, ত্রাণ এবং বিচারের কর্তা যে নন সেকথাই এতদ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

www.icsbook.info

এই হল খৃস্টানদের ধর্মীয় দর্শনের মোটামুটি পরিচয়। অতঃপর ইসলামের ধর্মীয় দর্শন সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, ইসলামের মূল কথা হল এই বিশ্ব নিখিলের যিনি স্রষ্টা তিনি শুধু স্রষ্টাই নন সর্বশক্তিমান, ইচ্ছাময়; সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী, বিচারকর্তা, প্রভু এবং প্রতিপালকও তিনিই। অতএব ইসলামের দৃষ্টিতে তিনি একাই পরম, একাই চরম এবং তাঁর ইচ্ছা বা আদেশমাত্রই সবকিছু হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তাঁর যে কোনও সহকারী-সাহায্যকারী, অংশীদার-সমকক্ষ প্রভৃতি থাকতে পারে না, থাকা যে সম্ভবই নয় সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। সৃষ্টির সেরা বা আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে গড়ে ওঠার জন্য এই পৃথিবীই হল তার কর্মক্ষেত্র। সে জন্যই পৃথিবীকে 'পরকালের শস্যক্ষেত্র' বলা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে যা রোপণ বা বপন করা হবে হুবহু তারই ফল বা ফসল সেখানে পাওয়া যাবে। মোটকথা, এখানে আদর্শ মানুষ বা আল্লাহর যোগ্য প্রতিনিধি হয়ে গড়ে ওঠা বা না ওঠার ওপরেই তথাকার পুরস্কার বা শাস্তি একান্তরূপেই নির্ভর করছে।

মানুষকে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কিভাবে সেই উদ্দেশ্য সফল ও সার্থক হতে পারে স্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ হিসেবে একমাত্র তিনিই সম্যকরূপে সেকথা পরিজ্ঞাত রয়েছেন। আর মানুষ যে ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয় এবং মন-গড়া পথে চলতে গিয়ে মানুষ যে তার নিজের এবং আরও অনেকের সর্বনাশ ঘটাতে পারে নিশ্চিতরূপেই যেকথাও তার অজানা নয়।

অন্যদিকে প্রভু হিসেবে যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান প্রবর্তনের যোগ্য অধিকারীও একমাত্র তিনিই। সেই কারণে মানুষের জন্য তিনি এক পরিপূর্ণ জীবনবিধান প্রবর্তন করে উক্ত জীবনবিধানের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, "একমাত্র আমার দাসত্ব করার উদ্দেশ্যেই আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি।" এমতাবস্থায় একটি মুহূর্তের জন্যও কোনওভাবে, কোনও অবস্থায় এবং কোনও অজুহাতে অন্য কারও আদেশ মেনে চলা বা দাসত্ব করার সুযোগ যে কোনও মানুষেরই নেই সেকথা বলাই বাহুল্য।

উল্লেখ্য, অন্যত্র তিনি মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেছেন। দাসত্ব ছাড়া প্রতিনিধিত্ব যে সম্ভব নয় এতদ্বারা সেকথাই বোঝানো হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে যেকথা বলা প্রয়োজন তা হল, তাঁর সত্যিকারের দাস বা

www.icsbook.info

সত্যিকারের প্রতিনিধিরূপে গড়ে ওঠার অর্থই হল সৃষ্টির সেরা বা আদর্শ মানুষরূপে গড়ে ওঠা। আর ইসলামী জীবনবিধানে রয়েছে এই গড়ে ওঠারই প্রেরণা ও পথনির্দেশ।

সেখানে বলা হয়েছে : সৃষ্টির সেরা হয়ে গড়ে ওঠার স্বার্থেই মানুষের মধ্যে লোভ-লালসাদি রিপু-নিচয়ের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে এবং ভোগের সামগ্রী ও লোভের উপকরণসমূহ আকর্ষণীয়ভাবে চারদিকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

নিশ্চিতরূপেই মানুষের জন্য এ এক মহাপরীক্ষা। সাফল্যের সাথে নশ্বর পার্থিব জীবনের এ মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ওপরই নির্ভর করছে অবিনশ্বর সেই অপার্থিব জীবনের মহা পুরস্কার। মনে রাখা প্রয়োজন যে, পরীক্ষা যত বেশি কঠোর হয় সাফল্যের গৌরব এবং মর্যাদাও তত বেশি হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে বিবেক-বুদ্ধির তাগিদ, চারদিকে ছড়ানো বাস্তব নিদর্শনসমূহ, ইতিহাসের শিক্ষা, ধর্মীয় বিধানের কঠোর ও সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী প্রভৃতি উপেক্ষা-অবহেলা করে যে ব্যক্তি এই পার্থিব জীবনকেই সর্বোতভাবে আঁকড়ে ধরবে, সুনিশ্চিতরূপেই সে ব্যক্তি তার পারলৌকিক জীবনের জন্য এক মহা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকেই করে তুলবে অলঙ্ঘ্য ও অবধারিত।

আলোচনা আর দীর্ঘায়িত না করে, যেহেতু উন্নত ও আদর্শ জীবন গড়ে তোলা মানুষ মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য অন্তত তাই হওয়া উচিত, অতএব এ দুটি ধর্মীয় দর্শন স্মৃতিপটে জাগরূক রেখে অতঃপর ধরে নেয়া যাক যে, উন্নত ও আদর্শ জীবন গড়ার প্রয়োজনে ধর্মান্তরগ্রহণ অপরিহার্য বিবেচিত হওয়ায় দু'ব্যক্তি এই একই উদ্দেশ্যে যাত্রা করে একজন খৃস্টধর্ম এবং অন্য জন ইসলামগ্রহণ করল। যে ব্যক্তি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করলো সে ব্যক্তি যে পারলৌকিক জীবনের স্বার্থে এ জীবনকে উন্নত ও আদর্শ করে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হবে না, এমনকি, সে প্রয়োজনই বোধ করবে না সেকথা সহজেই অনুমেয়। কেননা, সে একথাকে বেশ ভালভাবেই তার বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে যে "পারলৌকিক জীবনের হিসেব-নিকেশ বা শাস্তি ভোগের কোনও প্রশ্নই আমার নেই, ত্রাণকর্তা, অন্যতম ঈশ্বর এবং 'ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্র' যীশুখৃস্টই স্বয়ং আমার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন।"

এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি যে পরকালের চিন্তা বাদ দিয়ে পেট ও প্রবৃত্তির তাড়নায় একান্তরূপেই এই পার্থিব সম্পদের আহরণ ও উপভোগের কাজে আত্মনিয়োগ করবে সুনিশ্চিতরূপেই সেকথা বলা যেতে পারে। আর এটা যে সে করবেই সে প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে অন্যত্র যাওয়ার কোনও প্রয়োজন হয় না। কেননা, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ আমাদের চোখের সম্মুখেই রয়েছে।

www.icsbook.info

অবশ্য সেজন্যে আদি বা পুরাতন খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিরা অথবা নব-দীক্ষিত খৃস্টানদের মোটেই দায়ী করা যেতে পারে না। কেননা, যীশুখৃস্টের আদর্শে জীবন গড়তে হলে মানুষকে ঘর-সংসার, বিবাহ, সন্তানোৎপাদন, অর্থোপার্জন প্রভৃতি ছেড়ে দিয়ে শুধু নিদারুণ দুঃখ-কষ্টই বরণ করে নিতে হয় না, সমূলে নির্বংশও হয়ে যেতে হয়। সুতরাং ইচ্ছা করে অন্তত নির্বংশ হয়ে যাওয়ার পথ কেউ বেছে নিতে পারে না।

অন্যদিকে বাইবেলের বর্ণনা এবং খৃস্টজগতের বিশ্বাসানুযায়ী যীশুখৃস্ট হলেন ত্রাণকর্তা, ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্র, মৃতের জীবনদাতা এবং আরও অনেক কিছু! অর্থাৎ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার সম্পূর্ণ বাইরে ঊর্ধ্ব-জগতের এক অনুপম-অতুলনীয় মহান সত্তা।

এমতাবস্থায় কোনও মানুষের পক্ষে তাঁর চরিত্রকে নিজেদের জীবন গড়ার আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা শুধু অসম্ভবই নয়, কল্পনাতীতও। অতএব অন্তত এই দুটি অবস্থার জন্য একান্ত বাধ্য হয়েই 'যেমন খুশী তেমন চল' এই নীতিগ্রহণ করা ছাড়া কোনও গত্যন্তরই থাকে না।

পক্ষান্তরে ইসলামগ্রহণকারী ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং পারলৌকিক শাস্তির ভয়ে ইসলামগ্রহণের সাথে সাথেই যে পরকালের শস্যক্ষেত্ররূপী এই পার্থিব জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নিজেকে আদর্শ মানুষ বা আল্লাহর যোগ্য প্রতিনিধিরূপে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করবে এবং তাই যে স্বাভাবিক আশা করি আপনাদের মতো জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের কাছে সেকথা খুলে বলার কোনও প্রয়োজনই হবে না।

অবশ্য একাজে তার বিশেষ দুটি সুযোগও রয়েছে। একটি হল, তার সম্মুখে রয়েছে আল্লাহর দেয়া এমনই এক অনবদ্য জীবনবিধান; যা একান্ত-রূপেই সহজ-সরল এবং সকল প্রকার ভুল-ত্রুটি, আবিলতা প্রভৃতি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

আর অন্যটি হল, এমনই এক মহাপুরুষের জীবনাদর্শ যিনি শুধু বিশ্বের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী (স)-ই নন, মানবতার এক সুমহান আদর্শও। নিজেকে ঈশ্বরের অংশ, অবতার, সমান, সন্তান বা অতিমানব-মহামানব প্রভৃতির কোনওটা বলেই তিনি দাবি করেননি। কারণ, সে সবের কোনওটাই তিনি ছিলেন না। সর্বোতভাবেই তিনি ছিলেন আদর্শ মানুষ, মানুষের আদর্শ। মানুষের আদর্শ করেই তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। মানুষই মানুষের আদর্শ হতে পারে এবং তাই যে সঙ্গত ও স্বাভাবিক আশা করি সে সম্পর্কে আপনাদের কাছে কোন উদাহরণ তুলে ধরার প্রয়োজন হবে না।

www.icsbook.info

বলাবাহুল্য, এমন এক অনাবদ্য জীবনবিধান এবং এমন এক সুমহান আদর্শকে আঁকড়ে ধরার ফলে ইসলামগ্রহণকারী ব্যক্তির জীবন সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে গড়ে না উঠে পারে না। এক যাত্রার কেন এবং কিভাবে ভিন্ন ফল হয়ে থাকে সে কথা এ থেকে অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারবেন বলে দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করি।

আমার প্রিয় খৃস্টান ভাই-বোনেরা! বিদায়ের পূর্বে ভাল করে ভেবে দেখার জন্য শেষবারের মতো আর দুটি মাত্র কথা আপনাদের কাছে রেখে যেতে চাই :

ইসলাম, আর ইসলামের কথাইবা বলি কেন; সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিও একথাই বলে যে, মানুষের দ্বারা মোটামুটি দু'ভাবে পাপ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এক : সৃষ্টিকর্তার আদেশ লংঘন; দুই :সৃষ্টজীবের ক্ষতিসাধন।

বলাবাহুল্য, যার আদেশ লংঘন এবং যার বা যাদের ক্ষতি সাধনের ফলে পাপ অনুষ্ঠিত হয় একমাত্র তিনি বা তাঁরাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ক্ষমা করার অধিকারী। অর্থাৎ তিনি বা তাঁরা ক্ষমা না করা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোনওক্রমেই পাপ থেকে ত্রাণ লাভ করতে পারে না।

এমতাবস্থায় কেউ যদি কোনওভাবে যীশুখৃস্টের ক্ষতি সাধন করে পাপী হয়ে থাকে তবে একমাত্র সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ক্ষমা করা এবং ত্রাণ লাভের সুযোগ করে দেয়ার অধিকার যীশুখৃস্টের থাকতে পারে।

কিন্তু যারা সৃষ্টিকর্তার আদেশ লংঘন অথবা কোনও মানুষ বা কোনও জীবের ক্ষতি সাধন করে পাপী হয় তাদের সকলের জন্য এমন পাইকারীভাবে প্রায়শ্চিত্তকরণ, ত্রাণদান বা পাপমুক্তকরণের কোনও অধিকারই যীশুখৃস্টের থাকতে পারে না।

অথচ অতীতে পাদ্রী-পুরোহিতরা যীশুখৃস্টের এই অধিকার থাকার এক মনগড়া দলিল আপনাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

তাঁদের এ সম্পর্কীয় দলিলটি যে অন্যান্য অনেক দলিলের মতো মনগড়া, যুক্তিহীন এবং স্ববিরোধী সেকথা যে আপনারা বোঝেন না, তা নয়। কিন্তু নানা কারণে সবকিছু বুঝেও আপনাদের অবুঝ সাজতে হয়েছে।

অন্যান্য অনেক দলিলের মতো তাঁদের এ দলিলটিও যে মনগড়া, যুক্তিহীন এবং স্ববিরোধী সে সম্পর্কে ভাল করে ভেবে দেখার সুবিধা হবে বলে বিষয়টির ওপর কিছুটা আলোকপাত করা যাচ্ছে :

বলা হয়ে থাকে : "নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে মানবজাতির আদি পিতা পাপী হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর সন্তান-সন্ততিরা তথা গোটা মানবজাতিই জন্মগতভাবে পাপী"।

www.icsbook.info

"যেহেতু কোনও পাপী মানুষের দ্বারা অন্য কোনও পাপী মানুষের ত্রাণ, পাপ মোচন বা প্রায়শ্চিত্তকরণ সম্ভব নয় অতএব পাপীষ্ট মানবজাতির পাপ মোচন বা পরিত্রাণ দানের জন্য সদাপ্রভু (ঈশ্বর) তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুখৃস্টকে নিজের ঔরসে জন্মদান করেন। আর যেহেতু যীশুখৃস্ট আদিপিতা বা কোনও মানুষের ঔরসজাত নন অতএব তিনি নিস্পাপ এবং মানবজাতির ত্রাণকর্তা"।

অতীতের পাদ্রী-পুরোহিতরা কর্তৃক যীশুখৃস্টকে নিস্পাপ নিষ্কলঙ্ক এবং ত্রাণকর্তা বানানোর এই যুক্তি কোনওক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেননা, প্রথমত: স্বেচ্ছাকৃতভাবে পাপ বা পুণ্য কাজের অনুষ্ঠান ব্যতীত কোনও মানুষ পাপী বা পুণ্যবান বলে অভিহিত হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত: শিশুরা যে নিস্পাপ এবং নিষ্কলঙ্ক আবহমানকাল ধরে এটা সর্ববাদীসম্মত সত্যরূপে গৃহীত হয়ে আসছে।

তৃতীয়ত: অতীব জঘন্য ধরনের পাপী মানুষদের ঔরসে অতি পুণ্যবান এমনকি প্রখ্যাত মহাপুরুষের এবং অতি পুণ্যবান মানুষের ঔরসে পাপীষ্ট নরাধমের জন্ম অহরহই আমরা প্রত্যক্ষ করে চলেছি। এমতাবস্থায় জন্মসূত্রে পাপী বা পুণ্যবান হওয়াকে সত্য এবং বাস্তবসম্মত বলে আমরা মেনে নিতে পারি না।

চতুর্থত: যীশুখৃস্টকে সদাপ্রভুর 'ঔরসজাত' একমাত্র পুত্র বলা হলেও বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী তাঁর জন্ম হয়েছিল 'পবিত্রাত্মা বা গেব্রীয়েলের' দ্বারা। অতএব তাঁকে সদাপ্রভুর ঔরসজাত বলাটা যে বাইবেলবিরোধী এবং পাদ্রী-পুরোহিতদেরই উদ্ভট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কল্পনা সেকথা অতি সহজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। বলাবাহুল্য, ঔরসজাত না হলে রক্তের সম্পর্ক স্থাপিত হয় না, পিতৃসম্পদেরও অধিকারী হওয়া যায় না।

পঞ্চমত: প্রায়শ্চিত্তবাদ তথা যীশুখৃস্ট কর্তৃক ক্রুশে প্রাণ দানের মাধ্যমে খৃস্টজগতের যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তকরণের এই থিওরি খোদ খৃস্টানরাই বিশ্বাস করেন না।

কেননা যদি বিশ্বাস করতেন তবে চোর, ডাকাত, খুনী প্রমুখ পাপীদের বিচার ও শাস্তি প্রদানের জন্য আইন, আদালত, জেলখানা, ফাঁসির মঞ্চ প্রভৃতির অস্তিত্ব অন্তত তাঁদের দেশে খুঁজে পাওয়া যেতো না।

খোদ যীশুখৃস্ট যাদের পাপের জন্য আগাম প্রায়শ্চিত্ত করে তাদের নিস্পাপ বা পাপমুক্ত করে গেছেন বলে দাবি করা হয়ে থাকে তাদের পাপী সাব্যস্তকরণ ও শাস্তিপ্রদান যে শুধু স্ববিরোধীই নয় বরং গোটা প্রায়শ্চিত্তবাদ এবং খোদ

www.icsbook.info

যীশুখৃস্টের জন্যও অতি জঘন্যভাবে অবমাননাকর সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ষষ্ঠত: যীশুখৃস্ট বা অন্য কেউ যে সদা প্রভুর ঔরসজাত হতে পারেন না অন্তত যীশুখৃস্ট যে তাঁর ঔরসজাত 'একমাত্র পুত্র' নন খোদ বাইবেল থেকে তার কতিপয় প্রমাণ তুলে ধরা যাচ্ছে :

o ইস্রাইল (আ) অর্থাৎ বাইবেলের ভাষায় যাকোবকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে, যথা : And than shall say unto Pharaon, thus saith the dord, Israil is my son, even my first born. —Exodus 4 : 22.

অর্থাৎ আর তুমি ফরৌনকে কহিবে, সদা প্রভু এই কথা কহেন, ইস্রাইল আমার পুত্র, আমার প্রথমজাত।

o ডেভিড (দাউদ আ)-কেও ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে, যথা : I will declare the decree : the Lord hath said unto me Jhon art my son this day have I begotten Thee. —Psalus 2 : 7

অর্থাৎ আমি সেই বিধির বৃত্তান্ত প্রচার করিব; সদা প্রভু আমাকে কহিলেন তুমি আমার পুত্র; অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছি।

o সলোমন (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে :

He shall build a house for my name and he shall be my son, and I will be his father and I will establish the throne of his kingdom over Israil for every. —Chroriscles 22 : 10.

অর্থাৎ— সে (সলোমন) আমার নামের জন্য গৃহ নির্মাণ করিবে। আর সে আমার পুত্র হইবে, আমি তাহার পিতা হইব এবং ইস্রায়েলের উপরে তাহার রাজ সিংহাসন চিরকালের জন্য স্থির করিব।

এ নিয়ে উদ্ধৃতির সংখ্যা আর বাড়াতে চাইনা। তার প্রয়োজনও নেই, কেননা যীশুখৃস্ট ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্র হওয়া সম্পর্কে পাদ্রী-পুরোহিতদের দাবি যে মিথ্যা এবং বাইবেল-বিরোধী এই কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃতি থেকেই তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বলাবাহুল্য, ওপরের এই উদ্ধৃতির মধ্যে পুত্র, সন্তান, ঔরসজাত প্রভৃতি শব্দগুলোর কোনওটাই আসল অর্থজ্ঞাপক নয়; ভালবাসা, ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। শুধু প্রখ্যাত নবী-রাসূলের বেলায়ই নয়, অন্য ধরনের মানুষদের বেলায়ও এসব শব্দ ব্যবহৃত হওয়ার বহু

www.icsbook.info

প্রমাণ বাইবেলে বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ এ সম্পর্কীয় দুটি মাত্র উদ্ধৃতি নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে :

০ যারা শত্রুকে ভালবাসে তাদেরওও ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে। যথা : কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে তাড়না করিয়া তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও। যেন তোমরা নিজদিগের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও। — মথি ৫ : ৪৪—৪৫

০ অনুরূপভাবে শান্তি স্থাপনকারীদেরও ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে। যথা : ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়, কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে। — মথি ৫ : ৯

এই সব উদ্ধৃতি থেকে অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, যীশুখৃস্টের পুত্রত্ব অর্থাৎ সদাপ্রভুর ঔরসজাত একমাত্র পুত্র হওয়ার যত দাবিই পাদ্রী-পুরোহিতরা করুন না কেন, আসলে তা ভিত্তিহীন, স্বকোপলকল্পিত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

আর পুত্রত্বের দাবিই যদি সত্য না হয় তবে যে পাদ্রী-পুরোহিতদের ত্রাণবাদ, প্রায়শ্চিত্তবাদ, স্বর্গারোহনবাদ প্রভৃতি সবকিছুই মাঠে মারা যায় আশা করি এ সহজ-সরল কথাটা অবশই আপনারা বুঝতে পারবেন।

www.icsbook.info

উপসংহার

ইচ্ছা এবং আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও যেসব কারণে আমি খৃস্টধর্মগ্রহণ করিনি সে কারণগুলো মোটামুটিভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমি লেখক, সাহিত্যিক, পণ্ডিত প্রভৃতির কোনওটাই নই। তাই বিষয়বস্তু যেভাবে তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল আমার অযোগ্যতার জন্য সেভাবে তুলে ধরতে পারিনি বলে বিশেষভাবে দুঃখিত।

পরিবেশের শিকার আধুনিককালের খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদের বা অন্য কারও বিশ্বাস বা অনুভূতিতে সামান্যতম আঘাত দেয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। তথাপি আমার অযোগ্যতার জন্য কারও মনে আঘাত লাগার মতো কিছু যদি লিখে থাকি সে জন্য আমি বিশেষভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

খৃস্টধর্মগ্রহণ না করলেও উক্ত ধর্ম বিশেষ করে বাইবেলের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী হয়ে রয়েছি। কারণ উক্ত গ্রন্থ থেকেই আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছিলাম।

কথাটি আরও পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে যে, হযরত মুহাম্মদ (স)-ই যে, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বাইবেল থেকেই সর্বপ্রথমে আমি সেকথা জানতে পারি।

বাইবেল নতুন ও পুরাতন নিয়ম বিশেষ করে যোহন লিখিত সুসমাচারের ১৪ থেকে ১৬ অধ্যায়ে (১৪ : ১৬—৭১; ১৪ : ২৫—২৬; ১৪ : ৩০; ১৫ : ২৬; ১৬ : ৭; ১৬ : ১২-১৫) হযরত মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে যেসব কথা লিখা রয়েছে সেগুলো আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে, আমি সম্ভাব্য সূত্রসমূহ থেকে তাঁর পরিচয় জানার চেষ্টা করতে থাকি।

বিশেষভাবে চেষ্টা সাধনার পরে 'Muhammad in world scriptures' এবং ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় এম, এ (রিসার্চ স্কলার প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়) প্রণীত 'বেদ-পুরাণে হযরত মুহাম্মদ' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ পাঠের সুযোগ আমি লাভ করি।

www.icsbook.info

বিভিন্ন জনের লিখা তাঁর পবিত্র জীবনচরিত লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণের প্রচেষ্টা-পদ্ধতি আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে।

আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করি যে, শুধু অতীতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় বিধান-সমূহই নানা কারণে বিকৃত ও অতিরঞ্জিত হয়নি ওসবের ধারক এবং বাহকগণসহ পৃথিবীতে যত ধর্মীয় মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের জীবনচরিতসমূহ ও যথাযোগ্যভাবে সঙ্কলন সংরক্ষণের অভাব, অতিভক্তি ও অন্ধভক্তির প্রাবল্য, সময়ের ব্যবধান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতির জন্য অদ্ভূত, অলৌকিক ও অতিমানবিক কল্প-কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে।

একমাত্র মুসলমানরাই যে অক্লান্ত সাধনায় পবিত্র কুরআন এবং হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পবিত্র জীবনীকে নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছেন গভীরভাবে চিন্তা, গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সে বিশ্বাস আমার মনে দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমি দ্বিধাহীন চিত্তে একথা বুঝতে পারি যে, হযরত মুহাম্মদ (স)-ই একমাত্র মহাপুরুষ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যাঁর জীবনী অনুসরণ করে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে ওঠা সম্ভব।

কথাটিকে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, অতীতের মতো তিনি শুধু একজন স্বর্গীয় মহাপুরুষই ছিলেন না; একাধারে তিনি ছিলেন ধর্মোপদেষ্টা, সংসারী, বিরাগী, সমাজসেবক, সেনাপতি, ব্যবসায়ী, বাগ্মী, রাষ্ট্রপরিচালক, সংগঠক, ত্যাগী, সংযমী, ধৈর্যশীল, একনিষ্ঠ ধার্মিক প্রভৃতি, আর এ সবের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শ।

এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে এখানে অন্য যে বিষয়টি তুলে ধরা প্রয়োজন তা হলো :

গ্রহণযোগ্য একটি ধর্ম খুঁজতে গিয়ে যখন বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করছি তখন আমি অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ্য করি যে, আবহমান-কাল ধরে ধর্মের নামে পৃথিবীতে নরহত্যা, নারীনির্যাতন, সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে কন্যা নিক্ষেপ, নবজাত কন্যাসন্তানকে হত্যা অথবা জীবন্ত-প্রোথিতকরণ, মদ্যপান, গাঁজা-ভাং-আফিম সেবন, ব্যভিচার, উলঙ্গপনা, জুয়াখেলা, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা, অবহেলা, জাতিভেদ, শোষণ-নির্যাতন প্রভৃতি অতীব জঘন্য ও মানবতাবিরোধী কাজগুলো অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

শুধু তা-ই নয়, ভিন্ন ভিন্ন এতগুলো ধর্ম প্রচলিত থাকার কারণেই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ ও সংঘাত-সংঘর্ষ চালু রয়েছে এবং চিরকালই চালু থাকবে।

অবস্থা দৃষ্টে একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, ধর্মই এসব কিছুর জন্য দায়ী।

www.icsbook.info

মজার ব্যাপার হল— প্রতিটি ধর্মের মানুষই তার নিজ নিজ ধর্মকে আদি-অকৃত্রিম, সত্য-সনাতন এবং স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টার পবিত্র মুখ-নিসৃত বলে দাবি করে থাকে। এমতাবস্থায় অর্থাৎ সকলের দাবি যদি সত্য হয় তবে ধরে নিতে হয় যে, পৃথিবীতে ধর্মের নামে যত অনাচার, পাপ-দুর্নীতি ও সংঘাত-সংঘর্ষ ঘটেছে এবং আবহমানকাল ধরে ঘটতে থাকবে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই এসবের জন্য দায়ী; কারণ তিনিই ভিন্ন ভিন্ন এতগুলো ধর্মের উদ্ভব ঘটিয়েছেন।

অথচ বিশ্বস্রষ্টার মতো সুমহান সত্তা যে এমন জঘন্য কাজ করতে পারেন কোনও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই একথা মেনে নিতে পারে না।

এই না পারার অন্য কারণও রয়েছে। তা হলো : প্রতিটি বিবেক প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করে চলেছে যে, বিশ্বস্রষ্টা একটি মাত্র প্রাকৃতিক বিধানের ধারা আবহমানকাল যাবত জীব-জড়, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, অণু-পরমাণু নির্বিশেষে নিখিল বিশ্বের কোটি কোটি সৃষ্টিকে অতীব সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করে চলেছেন।

এমতাবস্থায় শুধু মানবজাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন এতগুলো ধর্মের উদ্ভব তিনি ঘটাতে যাবেন কেন?

সুখের বিষয় ইসলামই এই প্রশ্নের নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য উত্তর দিয়েছে। আর তা হলো : তিনি মানবজাতির জন্য একটি মাত্র ধর্মেরই উদ্ভব ঘটিয়েছেন। মানুষেরাই তাকে ভিন্ন ভিন্ন ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেছে। পবিত্র কুরআনের এ সম্পর্কীয় কতিপয় বাণীর হুবহু বঙ্গানুবাদ নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে উদ্ধৃত করে যাচ্ছি?

"শুরুতে সব মানুষই এক দলভুক্ত ছিল তার পরে বিরোধ ও মতানৈক্য দেখা দিল। আল্লাহ্ যখন একের পর এক নবী পাঠাতে লাগলেন। তাঁর ভাল কাজের জন্য সুসংবাদ দিতেন এবং (মন্দ কাজের বিরুদ্ধে) সতর্ক করতেন। তার ওপর তাঁদের সঙ্গে আল-কিতাব (ওহী-সংকলন) অবতীর্ণ করেন। মানুষ যেসব ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করে তা তারই মীমাংসাবিধান।

— কুরআন ঃ ২ ঃ ২১৩ (মওঃ আকুল কালাম আযাদের "উম্মুল কুরআন"।

"হে নবীগণ! পবিত্র দ্রব্য আহার করুন এবং সৎকার্যে তৎপর থাকুন। আপনারা মূলত একই দলভুক্ত, আমি আপনাদের প্রভু। সুতরাং আপনারা আমাকে ভয় করে চলুন। কিন্তু পরবর্তীকালে মানুষেরা পরস্পর মতানৈক্য করে নিজেদের ধর্মকে পৃথক পৃথক করে নিয়েছে। এবং এতেই তারা পরিতুষ্ট (বোধ করছে)।"[১]

---

১. কুরআন ২৩:৫১-৫৩;

www.icsbook.info

"হে মানবজাতি! আমি তোমাদের একজন নর ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছে এবং সম্প্রদায় ও গোত্ররূপে স্থাপন করেছে। (তা এই জন্য যে) তোমরা একে অন্যের হক, দায়িত্ব এবং অধিকার বুঝবে। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে যে যত বেশি সৎ-কর্মশীল আল্লাহর নিকট সে তত মহৎ (বলে বিবেচিত)। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ই অবগত রয়েছেন।"[১]

"—বাস্তবিক এইতো তোমাদের জাতি, একমাত্র জাতি এবং আমি তোমাদের একমাত্র প্রভু ও প্রতিপালক, অতএব আমারই উপাসনা কর।"[২]

"আর (দেখ) তোমাদের এই জাতিগুলি মূলত একই জাতি এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক প্রভু। সুতরাং (আমারই-অর্চনার পথে তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও এবং) একমাত্র আমাকেই ভয় করে চল এবং সৎকার্যে তৎপর থাক।"[৩]

"(হে রাসূল!) আপনার আগের জাতিগুলোর খবর জানতে পাননি। নূহের কওম, আদ ও সামূদ কওম এবং তাদের পরবর্তী এরূপ অসংখ্য কওম যাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কারও জানা নেই, এই সকল কওমের ভেতর সত্যের আলোকবাহীরূপে নবী-রাসূল আবির্ভূত হয়েছেন। অথচ তারা মূর্খতা ও অহংকারে ডুবে তাঁদের শিক্ষা উপেক্ষা করিয়া চলেছিল।"[৪]

"নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা।"[৫]

"নিশ্চয় এটাই (ইসলাম) একমাত্র সত্য ও সুদৃঢ় পথ (তোমরা সকলে) এরই অনুসরণ কর এবং শয়তানের আনুগত্য করে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইওনা। (কেননা) সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৬]

বলাবাহুল্য, ইসলাম যে বিশ্বধর্ম এ থেকে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া মুসলমান মাত্রেরই জানা রয়েছে যে, ইসলামের মূল কালেমা একটিই। বিশ্বের আদি-মানব থেকে শুরু করে সকল নবী-রাসূলই এই একমাত্র কালেমার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

সন্দেহ ও বিতর্কের অবকাশ থেকে যাবে বলে এখানে বলা প্রয়োজন যে, প্রাচীন ধর্মীয় বিধানসমূহের অনেক শিক্ষাই পরবর্তীকালে যুগের অনুপযোগী হওয়ার কথা ইতোপূর্বে বলা হয়েছে; পাঠকবর্গ সেকথা অবশ্যই মনে রেখেছেন।

---

১. কোরআন ৪৯:১৩;
২. কুরআন ২১:৯২:
৩. কুরআন ২৩:৫২ ;
৪. কুরআন ৪:১৬৩—১৬৪;
৫. কুরআন ৩:১৮;
৬. কুরআন ২১:৩০।

www.icsbook.info

এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, ধর্ম যদি সত্য হয়, আর সত্য যদি সনাতন এবং চিরন্তন হয়, তবে তা কি করে যুগের অনুপযোগী হতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তর হল : ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্মের দুটি অংশ রয়েছে, একটি মূল; আর অন্যটি শাখা-প্রশাখা বা সেই মূলে উপনীত হওয়ার পথ-পদ্ধতি ও উপায়-উপকরণ প্রভৃতি।

ইসলামী পরিভাষায় এসবকে যথাক্রমে দীন এবং শরা বা শরীয়ত বলা হয়ে থাকে! দীন শব্দের মোটামুটি তাৎপর্য হলো লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কোনও প্রভু বা উপাস্য নেই। অন্তরের সাথে সুদৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস পোষণ ও তদানুযায়ী জীবন পরিচালনা। অন্য কথায় দীন অর্থ মানবজাতির জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবনবিধান।

বলাবাহুল্য, জীবন পরিচালনার বিষয়টি খুবই ব্যাপক ও জটিল। খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, উপায়-উপার্জন, আচার-ব্যবহার ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির নিয়ম-পদ্ধতি প্রভৃতি সবকিছু এর অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় সকল দেশে, এবং সব রকম পরিবেশে এগুলো একইরূপ হতে পারে না, হওয়া সম্ভবই নয়।

সে কারণেই ভিন্ন ভিন্ন নবী-রাসূলদের দীন চিরদিনই এক, অভিন্ন এবং অপরিবর্তনীয় থাকলেও শরীয়ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এখানে উল্লেখ্য, শেষনবী (স)-এর সময়ে শুধু দীনকেই পরিপূর্ণতা দেয়া হয়নি, যুগের অবস্থা, মানুষের মন-মানস, প্রয়োজন-পরিবেশ, সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি অনুকূল হওয়ায় শরীয়তকেও পরিপূর্ণতা দেয়া হয়েছে। অতঃপর দীনের মত শরীয়তও অপরিবর্তিত থাকবে।

ওপরের আলোচনা থেকে ইসলাম যে বিশ্বধর্ম সে সম্পর্কে আর কোনও সন্দেহ বা দ্বিমত থাকা উচিত নয়। কিন্তু উচিত না হলেও দ্বিমত ও সন্দেহ সৃষ্টির কাজ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এ সম্পর্কে দু'চারটি উদাহরণ তুলে ধরা হলে বিষয়টি সহজবোধ্য হবে বলে আশা করি।

আমার পূর্বতন আত্মীয়-স্বজনদের কতিপয় ছাড়াও অন্তত ভিন্ন ভিন্ন আর তিনটি ধর্মের কোনও কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে ধর্ম সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা এবং বাদানুবাদকালে আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি যে, তাঁরা সকলেই প্রথমত ধর্ম যে একটিই সে কথার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তবে সেটি যে তাঁদের নিজ নিজ ধর্মটি ছাড়া অন্য কোনওটি নয় সে দাবিও তাঁরা প্রত্যেকেই সমান তালে এবং সমান দৃঢ়তার সাথে করতে থাকেন।

www.icsbook.info

এ পর্যায়ে সুযোগ বুঝে তাঁদের কেউ কেউ বেশ জোরের সাথে এ মন্তব্যও করেছেন যে, "সব ধর্মের মূলই যখন এক তখন ধর্মান্তরগ্রহণের কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।"

যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তাঁদের এই দাবি খণ্ডন করার সাথে সাথেই আকস্মিকভাবে তাঁরা মোড় পরিবর্তন করেন এবং বলতে থাকেন "আসল কথা হল সব ধর্মের মূলই এক।"

কেউ কেউ এ কথার সমর্থনে চোখে মুখে বেশ বিজ্ঞতার ভাব ফুটিয়ে তুলে বলেছেন, আল্লাহ্-ঈশ্বর রাম-রহিম, কুরআন-পুরাণ, দীন-ধর্ম, সত্যপীর-সত্যনারায়ণ, হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি শুধু নামের পার্থক্য এবং বুঝের ভুল। মূলে কোনও পার্থক্যই নেই। যারা অজ্ঞ-অনুদার তারাই শুধু এ নিয়ে হৈ চৈ করে!"

কেউ কেউ আবার "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর" বলে ধর্ম নিয়ে কোনওরূপ আলোচনাকেই অন্যায় ও অসঙ্গত বলে মন্তব্য করেছেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় হিন্দু-মুসলমানকে 'এক মায়ের সন্তান' বলে প্রচারণা চালাতে এবং 'বন্দে মাতরম' ও 'আল্লাহু আকবর'কে এক সাথে মিলিয়ে মুসলমানকেও দেশমাতৃকার পূজকে পরিণত করে অচ্ছুৎদের সংখ্যা বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে দেখা গেছে।

বলাবাহুল্য, এগুলো সবই ছিল অজ্ঞতা-প্রসূত অথবা সুপরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস। বিভিন্ন মহল থেকে দ্বিমত এবং সন্দেহ সৃষ্টির প্রচেষ্টা যে চালানো হয়েছে এবং হয়ে চলেছে আশা করি সে সম্পর্কে আর কোনও উদাহরণ তুলে ধরার প্রয়োজন হবে না!

তবে অপরিসীম দুঃখ ও বেদনার সাথে বলতে হচ্ছে যে, এঁদের কার্যক্রম অজ্ঞতা-প্রসূত অথবা সুপরিকল্পিত যাই হোক সুস্পষ্টরূপেই তার একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু মুসলমান, বিশেষ করে তাঁদের কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তি যখন একই সুরে "সব ধর্মের মূলই এক" বলে মন্তব্য করেন তখন শুধু যে, তার অর্থই খুঁজে পাওয়া যায় না তাই নয়, রীতিমত বিস্মিত এবং হতাশাগ্রস্তও হয়ে পড়তে হয়।

যাঁরা পূর্বোক্তদের মতো অজ্ঞতার জন্য বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে এটা করেন বোধগম্য কারণেই তাঁদের অজ্ঞতা নিরসন বা সৎপথ প্রদর্শনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে থাকে বলে সেদিকে না গিয়ে যাঁরা সদিচ্ছা-প্রণোদিত বা সত্যোপলব্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করে থাকেন তাঁদের চিন্তার খোরাক হিসেবে অতি বিনয়ের সাথে কয়েকটি কথা আমি বলতে চাই। সে কথাগুলো হল :

www.icsbook.info

০ 'সব ধর্মের মূলই এক' এখানে 'সব ধর্ম' বলতে বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন বলে পরিচিত সব ধর্মকেই বোঝায়। এর মাঝে মানুষের স্বকোপলকল্পিত ধর্মগুলোও রয়েছে। অতএব, এতদ্বারা আসল ও নকলকে একাকার করে ফেলা হয়। সুতরাং কোনও মুসলমান এমনকি সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন কোনও ব্যক্তির পক্ষে 'সব ধর্মেরই মূল এক' বলে আসল ও নকলকে একাকার করে ফেলা শোভন, সঙ্গত এক বিজ্ঞজনোচিত কাজ হতে পারে না।

০ যদি বলা হয় যে, নকল বা স্বকোপলকল্পিতগুলোর কথা বাদ দিয়েই এ মন্তব্য করা হয়ে থাকে তাহলে আমি ভেবে দেখতে অনুরোধ জানাবো যে, নকল বা স্বকোপলকল্পিত ধর্মগুলোর সুদীর্ঘকাল থেকে চালু থাকা এবং স্বার্থপরতা ও ভেদবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে সত্য বা আসল ধর্মকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত ও সেগুলোতে নানা ধরনের আবিলতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে যে অবস্থায় সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে কোনটি আসল আর কোনটি নকল তা নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় নকল বা স্বকোপলকল্পিত ধর্মগুলোকে বাদ দেয়ার কথা বলা হলেও কার্যত তা সম্ভব নয়। আর যদি সম্ভব না হয় তা হলে এরূপ মন্তব্য থেকে বিরত থাকাই শোভন, সঙ্গত এবং বুদ্ধিমানের কাজ।

০ 'সব ধর্ম' বলতে যদি সত্য ধর্মকে ভিন্ন ভিন্ন করে এবং ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে যেগুলোকে ধর্ম বলে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেগুলোর কথা বোঝানো হয় তবে আমার অনুরোধ যে, যেহেতু সেগুলোর সংখ্যা এবং পরিচয় জানা সম্ভব নয় অতএব সেগুলোর কোন কোনটি সত্য ধর্মের খণ্ডিত অংশ আর কোন কোনটি নয়, তা নির্ণয় করা সম্ভব হতে পারে না। এমতাবস্থায় আসল-নকলের একাকার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অতএব এ ক্ষেত্রেও সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে।

০ 'সব ধর্ম' বলতে নিশ্চিতরূপেই অনেকগুলো ধর্মকে বোঝায়। যেহেতু পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ অর্থাৎ যিনি ধর্মের মূল উৎস বা স্রষ্টা তিনি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় 'একটিমাত্র ধর্ম' সৃষ্টি করার কথা পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করেছেন এবং বিশ্ববাসীকে সেই একটিমাত্র ধর্মকে স্বীকৃতি জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, কোনও মুসলমানের পক্ষে 'সব ধর্ম' বলার কোনও সুযোগ আছে কি না সে কথাটাও দয়া করে আপনারা ভেবে দেখবেন।

০ কোনও দায়িত্বশীল মুসলমান কর্তৃক 'সব ধর্মের মূলই এক' একথা উচ্চারিত হওয়ার অর্থই হলো অন্যান্য ধর্মের মানুষদের এ কথা বুঝতে সাহায্য করা যে, ইসলামও তাদের ধর্মের মতই একটি ধর্ম। এতদ্বারা ইসলামের গৌরব, সৌন্দর্য এবং ঐতিহ্যকে ভীষণভাবে ম্লান করা হয় কি না এবং এতদ্বারা অপরের

www.icsbook.info

পক্ষে ইসলামকে জানা এবং গ্রহণ করার ইচ্ছা ও আগ্রহ সৃষ্টিকে ব্যহত করা হয় কি না সেকথাটিও বিশেষভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।

০ মুসলমান মাত্রেরই একথা জানা রয়েছে যে, ধর্মের মূল বলতে বোঝায় "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু" অর্থাৎ— এক, অদ্বিতীয়, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং সর্বশক্তিমান বিশ্বপ্রভু আল্লাহর প্রতি অন্তরের অটল ও অবিচল বিশ্বাস এবং একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।

এমতাবস্থায় একত্ববাদ সম্পর্কে দুর্বোধ্য ও হেঁয়ালিপূর্ণ কিছুটা আভাস ইঙ্গিত থাকলেও প্রকাশ্যত যে সব ধর্ম দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, পৌত্তলিকতা, ইতর জীব-জন্তু এমনকি বিশেষ বিশেষ নর-নারীর গুপ্ত অঙ্গের পূজা করার মতো সম্পূর্ণরূপে একত্ববাদ-বিরোধী এবং নিশ্চিতরূপে জঘন্য কাজসমূহের শিক্ষা দিয়ে চলেছে, সেগুলোকে কোনও মতেই আল্লাহ বা সেই মূল উৎস থেকে উৎসারিত বলা যেতে পারে না। এমনকি সেগুলোকে ধর্ম বলে আখ্যাত করাকেও চরম অধর্ম না বলে পারা যায় না।

এমতাবস্থায় উদারতা, বিজ্ঞতা, ধর্মনিরপেক্ষতা অথবা উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় প্রদর্শন কিংবা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে রাম-রহিম ও কুরআন-পুরাণকে একাকারকারীদের অনুকরণে পাইকারীভাবে 'সব ধর্মের মূলই এক' এমন কথা বলার কোনও সুযোগ কোনও মুসলমানের আছে কিনা আপনারা সেকথাটা ভেবে দেখতে চেষ্টা করবেন; এও আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ।

০ কোনও দায়িত্বশীল মুসলমান যখন বলেন যে, 'সব ধর্মের মূলই এক' তখন অন্যান্য ধর্মের মানুষদের অনেকেরই এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, 'মূল' বা গোড়াই হলো আসল, অতএব, মূল বা গোড়া যখন ঠিক রয়েছে তখন ভাবনার কিছু নেই। নিশ্চিতরূপেই এটা যে ভুল সিদ্ধান্ত সে সম্পর্কে দ্বিমতের কোনও অবকাশ থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় কোনও মানুষ ভুল সিদ্ধান্তগ্রহণে উৎসুক বা তৎপর হতে পারে এমন ধরনের বক্তব্য-বিবৃতি প্রকাশ করা সঙ্গত হতে পারে না, সেকথা বলাই বাহুল্য।

০ মুসলমান মাত্রেরই এটা জানা থাকার কথা যে, আদি-মানব থেকে শুরু করে হযরত ইসা (আ) পর্যন্ত দু'লক্ষাধিক প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের কাছে ইসলামের যেসব বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল এবং অতিভক্ত-অন্ধভক্তের দল তার প্রায় সবগুলোকে নানাভাবে শুধু বিকৃত-অতিরঞ্জিতই করেনি মিথ্যা অশ্লীল ও অবিশ্বাস্য ঘটনার বিবরণ এবং প্রাচীনকালের আজগুবি কেচ্ছা-কাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়ে এমনই এক অবস্থায় পরিণত করেছিল যে, সেগুলোকে ধর্মীয় বাণী বলে মনে করার কোনও উপায়ই আজ আর নেই।

www.icsbook.info

তাছাড়া, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং ভিন্ন ভিন্ন মানবগোষ্ঠীর প্রয়োজন, পরিবেশ, গ্রহণযোগ্যতা প্রভৃতির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ বিধায় ওগুলো যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ ছিল না সেকথাও সহজেই অনুমেয়।

অতএব বিকৃত, অতিরঞ্জিত, অস্বয়ংসম্পূর্ণ এ সব গ্রন্থের পরিবর্তে সকল দেশের সকল যুগের এবং সকল মানুষের উপযোগী একখানা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। বলাবাহুল্য, সেই পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থই হলো পবিত্র কোরআন।

দীন বা ধর্মকে পরিপূর্ণতা দান সম্পর্কীয় পবিত্র কুরআনের বাণীটি সম্পর্কে লক্ষ্যণীয়। ধর্মের মূল থেকে শুরু করে কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লবাদি সব কিছু এতে রয়েছে বলেই যে একে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান বলা হয়ে থাকে সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

এমতাবস্থায় যে সব গ্রন্থের মূল খুঁজে পাওয়া এবং সত্যতা নির্ধারণ-এর কোনওটাই আজ আর সম্ভব নয়, আন্দাজ-অনুমানের ওপর নির্ভর করে সেগুলোর মূল আবিষ্কারের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় না গিয়ে, "সব গ্রন্থের মূল শিক্ষা যে পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে এবং তা যে পরিপূর্ণ জীবন-বিধান" এ কথাটিকে বিশ্ববাসীর কাছে সার্থকভাবে তুলে ধরাই আজ সর্বাধিক প্রয়োজন। বলাবাহুল্য, এ দায়িত্ব একান্তরূপেই মুসলমানসমাজের, এমতাবস্থায় তারা নিজেরাই যদি বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয় তবে শুধু নির্মম ধ্বংস-ই তাদের বিধিলিপি হয়ে দাঁড়াবে না, বিশ্বের যাবতীয় অন্যায়-অকল্যাণের জন্যও তাদের দায়ী হতে হবে। অতএব, যে মহাসত্যকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার সুমহান দায়িত্ব আমাদের পর অর্পিত হয়েছে; আসুন! তাকে সফল ও সার্থক করে তোলার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করি। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন। আমিন!

www.icsbook.info

খৃস্টান মণীষীদের দলে দলে ইসলামগ্রহণ

খৃস্টান মনীষীদের অনেকেই ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এর সুশীতল ছায়ায় আশ্রয়গ্রহণ করেছেন এবং করে চলেছেন। তাঁদের সকলের নাম ও পরিচয় তুলে ধরতে হলে বিরাট একখানা গ্রন্থ লিখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

আপাতত তা সম্ভব নয় বলে মাত্র চল্লিশজন পুরুষ এবং দশজন মহিলা এই মোট পঞ্চাশ জনের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হল। বলা বাহুল্য, এঁরা নিজ নিজ আগ্রহে ইসলামকে জানার চেষ্টা করেছেন এবং যথাযোগ্যভাবে যাঁচাই-বাছাই করার পরেই ইসলামগ্রহণ করেছেন।

স্থিরপ্রাজ্ঞ এবং সত্যানুসন্ধিৎসু খৃস্টান ভ্রাতা-ভগ্নিদের এঁদের অনুকরণে ইসলামকে জানা এবং যাঁচাই-বাছাই করার জন্য সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

	নাম	জন্মস্থান	সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
১।	আল হাজ্জ লর্ড হেডলি আল-ফারুক	ইংল্যান্ড	হাউজ অব লর্ডস্-এর সদস্য, প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও গ্রন্থকার।
২।	লিওপোল্ড ওয়েইস মুহাম্মদ আসাদ	অস্ট্রিয়া	প্রথমে ফ্র্যানফুটুর জেইটং (Franfurtur Zeitung) পত্রিকার বিশিষ্ট বৈদেশিক সাংবাদিক। পরে পাকিস্তান সরকারের ইসলামিক পুনর্গঠন বিভাগের ডাইরেক্টর; জাতিসংঘের বিকল্প প্রতিনিধি, Islam at the Cross Road, Road to Mecca প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি 'আরাফাত' নামে একটি পত্রিকাও বের করতেন।
৩।	স্যার আব্দুল্লাহ আর্টিবাল্ড হ্যামিলটন	ইংল্যান্ড	প্রখ্যাত কুটনীতিবিদ, ব্যারোনেট ও জমিদার।

www.icsbook.info

	নাম	জন্মস্থান	সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
৪।	মুহাম্মদ আলেক-জান্ডার রাসেল ওয়ের	ইউএসএ	সেন্ট জোসেফ গেজেটের সম্পাদক, কুটনীতিবিদ, গ্রন্থকার; আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটের ইসলাম প্রচার মিশনের অধ্যক্ষ।
৫।	স্যার জালালুদ্দীন লাউডার ব্রান্টন	ইংল্যান্ড	কুটনীতিবিদ ও জমিদার।
৬।	মুহাম্মদ আমান হোবোহম্ এম. এ. পিএইচডি. এল. এল. ডি. এফ-এস-পি	জার্মানি	রাজনীতিবিদ, ধর্ম প্রচারক ও সমাজকর্মী।
৭।	প্রফেসর হারুন মোস্তফা লিয়ন	ইংল্যান্ড	প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও গ্রন্থকার "La Societ International de philologic sciences et Beaux Art"-এর ভূতপূর্ব সেক্রেটারি জেনারেল। তিনি লন্ডন থেবে প্রকাশিত 'The Philomathe' নামক বৈজ্ঞানিক পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন।
৮।	ডা. আলী সেলম্যান বিনোইস্ট	ফ্রান্স	ডক্টর অব মেডিসিন।
৯।	ড. ওমর রল্ফ্ ব্যারন এহরেন ফেলস্	অস্ট্রিয়া	নৃতত্ত্বের অধ্যাপক ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা।
১০।	আল হাজ্জ ড. আব্দুল করীম গার্মেনাস্	হাঙ্গেরি	প্রাচ্যবিদ্যার অধ্যাপক।
১১।	ডা. হামিদ মারকাস্	জার্মানী	বৈজ্ঞানিক, গ্রন্থকার ও সাংবাদিক।
১২।	উইলিয়াম বার্চেল পিকার্ড	ইংল্যান্ড	গ্রন্থকার, কবি ও ঔপন্যাসিক।
১৩।	কর্ণেল ডোনাল্ড, এস্ রক্ওয়েল	ইউএসএ	কবি, গ্রন্থকার ও পুস্তক সমালোচক।
১৪।	প্রফেসর আর. এল. মেল্লেমা	হল্যান্ড	নৃতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক।
১৫।	মুহাম্মদ জন ওয়েবস্টার	ইংল্যান্ড	ইংলিশ মুসলিম মিশনের প্রেসিডেন্ট ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী।
১৬।	ইসমাইল উহয়েল যেজিয়েরস্কি	পোল্যান্ড	বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী।

www.icsbook.info

নাম	জন্মস্থান	সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
১৭। মেজর আব্দুল্লাহ ব্যাটার্সবে	ইংল্যান্ড	বৃটিশ সেনাবাহিনীর মেজর।
১৮। হুসেইন রৌফ	ইংল্যান্ড	বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও গ্রন্থকার।
১৯। থমাস ইরডিং	ক্যানাডা	বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও সমাজকর্মী।
২০। ফৈজুদ্দিন আহমদ অভারিং	হল্যান্ড	প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও লেখক।
২১। ওমর মিতা	জাপান	বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সমাজকর্মী।
২২। আলী মুহাম্মদ মোরি	জাপান	অর্থনীতিবিদ ও সমাজকর্মী।
২৩। প্রফেসর আব্দুল আহাদ দাউদ বি. ডি.	ইরান	প্রাক্তন রেভারেন্ড ডেভিড বেঞ্জামনি কেলডানি বি.ডি.
২৪। এইচ. এফ. ফেলোজ	ইংল্যান্ড	রাজকীয় নৌবহরের প্রাক্তন কর্মচারী।
২৫। মুহাম্মদ সুলায়মান তাকেউচি	জাপান	জাপানের মানব জাতিতত্ত্ব সোসাইটির সহযোগী।
২৬। এস. এ. বোড	ইউএসএ	বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও সমাজকর্মী।
২৭। বি. ড্যাডিস্	ইংল্যান্ড	ল্যাটিন, ফরাসি ও স্পেনীয় ভাষা অধ্যয়নরত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।
২৮। টমাস মুহাম্মদ ক্ল্যাটন	ইউএসএ	বিশিষ্ট সমাজকর্মী।
২৯। জে. ডবলিউ. লাড্ গ্রোড্	ইংল্যান্ড	প্রখ্যাত চিন্তাবিদ।
৩০। টি. এইচ. ম্যাক-বার্কলি	আয়ারল্যান্ড	বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও লেখক।
৩১। ডেভিস্ ওয়ারিংটন ফ্রাই	অস্ট্রেলিয়া	প্রখ্যাত সাহিত্যিক।
৩২। ফারুক বি. কারাই	জাঞ্জিবার	বিশিষ্ট সমাজকর্মী।
৩৩। মুমিন আব্দুর রাজ্জাক সেল্লিয়া	সিংহল	বিশিষ্ট সাংবাদিক।
৩৪। আবদুল্লাহ উয়েমুরা	জাপান	ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদ।
৩৫। ইবরাহীম ডু	মালয়	বিশিষ্ট চিন্তাবিদ।
৩৬। মুহাম্মদ গুন্নার এরিক্সন	সুইডেন	প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ।
৩৭। মিঃ রেক্সইনগ্রাম	ইউএসএ	আমেরিকার কোটিপতি ধনকুবের, বিখ্যাত Garden of Allah নামক চিত্রনাট্যের প্রযোজক।
৩৮। মি. রশীদ সার্প	ইংল্যান্ড	ইংল্যান্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান, সুবিদ্যান ও সমাজকর্মী।

www.icsbook.info

নাম	জন্মস্থান	সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
৩৯। মি. জে. মাইকেল	ইংল্যান্ড	সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, সম্মানের সাথে বি. এ. পাস করার পর গর্ডন কলেজে চাকুরি করেন।
৪০। আবদুল্লাহ্ ওয়াট কিনস	ইংল্যান্ড	লন্ডন নগরীর এক বিখ্যাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, সুপণ্ডিত ও লেখক।
৪১। মিস মাসউদা স্টেইনম্যান	ইংল্যান্ড	এঁরা প্রত্যেকেই উচ্চ শিক্ষিতা এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের। ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট পড়াশোনা করার পরে ইসলাম-গ্রহণ করেছেন।
৪২। মিস ম্যাডিস বি. জলি	ইংল্যান্ড	
৪৩। লেডি এডমিল জয়নাব কব্বলড্	ইংল্যান্ড	
৪৪। মিসেস সেসিলিয়া মাহমুদা ক্যারোলি	অস্ট্রেলিয়া	
৪৫। মিস ফাতেমা কাজুয়ে	জাপান	
৪৬। মিসেস আমিনা মোসলের	জার্মানী	
৪৭। মিস্ হেদায়েৎ বাড্	হল্যান্ড	
৪৮। মিস্ মরিয়ম জমিলা	আমেরিকা	
৪৯। মিস জুরি নাজিয়া	লন্ডন	
৫০। মিস ফিরোজা জ্যানেট ক্যারোল	ইউ. কে.	

www.icsbook.info

ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে খৃস্টান মনীষীদের অভিমত

অন্যান্য ধর্মাবলম্বী প্রখ্যাত ও সর্বজন-মান্য ব্যক্তিদের অনেকে ইসলামের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়েও নানা কারণে পৈত্রিক-ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারেন না। অগত্যা মনের উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে না পেরে তাঁদের কেউ কেউ নিজেদের অভিমত জনসমক্ষে তুলে ধরেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে সেগুলো সংগ্রহ করে অভিনিবেশসহকারে পাঠ করার সুযোগ আমার হয়েছিল এবং তা থেকে যথেষ্ট প্রেরণাও লাভ করেছিলাম।

যেহেতু খৃস্টধর্ম সম্পর্কে আলোচনাই এই পুস্তক লিখার মুখ্য উদ্দেশ্য, অতএব অন্যদের কথা ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র খৃস্টধর্মাবলম্বীদের ইসলাম সম্পর্কীয় অভিমতের যেগুলো সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল তার কয়েকটি বেছে নিয়ে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। আশা করি, অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা হলে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রই এ থেকে প্রেরণা লাভ করতে পারবেন।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মি. বসওয়ার্থ স্মিথ তাঁর 'লাইফ অব মুহাম্মদ (স)' নামক গ্রন্থের লিখেছেন, "একটি মহাজাতি, একটি মহাসাম্রাজ্য, একটি মহা ধর্ম এই তিনটির একত্র সমাবেশ জগতের ইতিহাসে এই প্রথম। যাহার তুলনা কোথাও নাই, যাহা হযরত মুহাম্মদ স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং নিরক্ষর, বর্ণজ্ঞান-শূন্য ছিলেন। অথচ এমন এক গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন যাহা একাধারে কাব্য, দৈনন্দিন উপাসনাপুস্তক, ব্যবস্থাপত্র ও বিরাট ধর্মশাস্ত্র"।

বিশ্ববিশ্রুত মহাকবি জর্জ বানার্ডশ তাঁর 'গেটিং মেরেইড' নামক পুস্তকে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, "এক শতাব্দীর মধ্যে সমূদয় পাশ্চত্যে জগত বিশেষত ইংল্যান্ড ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয়গ্রহণ করিবে"।

এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন "দি লাইট" পত্রিকার জানুয়ারি সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়। উক্ত ব্যাখ্যার বঙ্গানুবাদ হলো, "আমি হযরত মুহাম্মদের ধর্মকে সর্বদা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশেষ প্রকারে

www.icsbook.info

সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকি। তাহার কারণ, এই ধর্মের ভিতর অত্যাশ্চার্য জীবনশক্তি বিদ্যমান। ... . আমার বিশ্বাস হযরত মুহাম্মদের মত কোন মানুষ যদি বর্তমান জগতে মানবমণ্ডলীকে পরিচালিত করিবার জন্য নেতৃত্বগ্রহণ করেন তাহা হইলে এই জটিল সমস্যা সমাধান করিয়া মানবমণ্ডলী যাহাতে সুখে শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতে পারে তাহার পন্থা উদ্ভাবন করিতে পারেন। ..... আমার ভবিষ্যদ্বাণী এই যে, হযরত মুহাম্মদের ধর্মের অনুপ্রেরণায় জাগরিত হইয়া ইউরোপ আজ যাহা গ্রহণ করিবার সূচনা করিয়াছে, কাল তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবে। মধ্যযুগে খৃস্টধর্ম প্রচারকগণ ইসলাম ধর্মকে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছিল এবং হযরত মুহাম্মদ এবং তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মকে ঘৃণা করিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই অত্যাশ্চর্য্য শক্তিশালী মানব সম্বন্ধে আমি যতদূর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, তাঁহাকে খৃস্টের বিরোধী বলিয়া অভিহিত না করিয়া 'মানবের উদ্ধার-কর্তা' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে—" (দি লাইট, জানুয়ারি ১৯৩৩)।

ইংলন্ডের 'চার্চ কংগ্রেস অব ইংল্যান্ড' নামক মহাসভার অধিবেশনে প্রোথিতযশা রেভারেন্ড কানুন আই জাক টেলর তাঁর বক্তৃতায় উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন, "জগতের বহু দেশ ব্যাপিয়া ইসলাম মিশনারি ধর্মরূপে খৃস্টান অপেক্ষা অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছে। পৌত্তলিকতা পরিহার পূর্বক ইসলাম ধর্মের লোকের সংখ্যা কেবল যে খৃস্টানধর্মে দীক্ষিত লোকসংখ্যা অপেক্ষা বহুল পরিমাণে অধিকতর তাহাই নহে, পরন্তু সর্বক্ষেত্রে ইসলামের সহিত প্রতিযোগিতায় খৃস্টধর্ম প্রচার ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বী জাতিসমূহকে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এখন কোনও নূতন স্থানে ধর্মপ্রচার করা ত দূরের কথা, যে স্থানসমূহে পূর্বে খৃস্টানধর্ম প্রচারিত ছিল, তাহাও ক্রমশ খৃস্টধর্ম প্রচারকগণের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইসলাম মরক্কো হইতে জাভা এবং জাঞ্জিবার হইতে সুদূর চিন পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে এবং সম্প্রতি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া ইসলাম সুদীর্ঘ পদক্ষেপে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা প্রভৃতি সকল মহাদেশেই অধিকার করিতে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। কঙ্গো জামবেশিতে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিগ্রো অধ্যুষিত রাজ্যসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উগান্ডা ও সম্প্রতি ইসলামগ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের ভিত্তিমূল পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোতে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়া

www.icsbook.info

দিতেছে। কোটি কোটি ভারতবাসীর মধ্যে প্রায় এক চতুর্থাংশ এবং সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও অধিক মুসলমান।"

বিখ্যাত ঐতিহাসিক মি. জি. সি. ওয়েলস লিখেছেন, "আরবদের ভিতর দিয়াই বর্তমান জগত তাহার আলো ও শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে ল্যাটিন জাতির ভিতর দিয়া নহে।"

'হস্টোরিয়ান হিস্টোরি অব দি ওয়ার্লড'-এর ৭ম ভলিউম, ২৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত রয়েছে "মধ্যযুগে আরবরাই সভ্যতার একমাত্র প্রতীক ছিলেন। উত্তর হইতে অসভ্য জাতিসমূহের আক্রমণে বিপর্যস্ত ইউরোপকে তাঁহারাই বর্বরতার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।"

মেজর আর্থার মিন লিওনার্ড তাঁর 'ইসলাম ও তাহার নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "ইসলামের প্রতি ইউরোপের হীন অকৃতজ্ঞতা এবং ভ্রান্ত ভাবের পরিবর্তে সাধারণ কৃতজ্ঞতার ভাব থাকা উচিত। অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন যুগের মানব যখন কলহ-বিবাদ ও মূর্খতায় নিমগ্ন ছিল, তখন আরবদিগের অধীনে সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধন করিয়া মুসলিম সভ্যতার উজ্জ্বল প্রভা চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং উহা ইউরোপের শেষ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিকে সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত করিতে দেয় নাই। আরববাসীদিগের উচ্চশিক্ষা, সভ্যতা, মানসিক ও সামাজিক উৎকর্ষ এবং তাহাদিগের উচ্চ শিক্ষার প্রণালী প্রবর্তিত না হইলে ইউরোপ অদ্যাপিও অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিত।"

হেনরি লুইস তাঁহার দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাসে লিখেছেন, "মুসলমানগণই ইউরোপে বিদ্যা ও দর্শন আনয়ন করিলেন। এই মহৎ কার্যের জন্য ইউরোপ তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞ। গণিতশাস্ত্র, ভেষজ রত্নাবলী এবং রসায়নবিদ্যার জন্যও তাঁহাদের নিকট উপকার স্বীকার করে। তাঁহাদের স্পেন হইতে ফ্রান্সের অভ্যন্তর দিয়া খৃস্টরাজ্যসমূহে বিদ্যার বিস্তার সম্ভব হইয়াছে।"

রেভারেন্ড মার্গোলিয়থ এম, এ লিখেছেন, "ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বর্গ-মর্ত্তের সৃজন পালন ও রক্ষাকর্তা, সর্বজ্ঞানময়, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর, যিনি এক এবং অদ্বিতীয়, এই ঐশী স্বভাব অতি তেজস্বীতার সহিত হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত করিতে পবিত্র কুরআন সর্বোচ্চ প্রশংসনীয় মহাধর্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থে বহু তত্ত্বপূর্ণ নীতিকথা, গভীর জ্ঞানোপদেশ এবং ওজস্বিনী রাজনীতি এমনভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যাহা সম্যক প্রকারে আলোচনা করিয়া কর্মক্ষেত্রে প্রতিফলিত করিতে পারিলে একটি প্রবল শক্তিশালী জাতি গঠিত হইতে পারে। এই পবিত্র কুরআনের অন্তর্নিহিত বিপুল কর্মশক্তি এবং তত্ত্বপূর্ণ

www.icsbook.info

মৌলিক তথ্য যাহা হইতে সমাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি মানবজীবনের সমস্ত কার্য-প্রণালী উদ্ভূত হইয়াছে তাহা এই প্রকারে গৌরব ও সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া জাতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। এবং যাহারা স্বেচ্ছায় পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল এই পবিত্র কুরআনই তাহাদিগের চিরাচরিত কুসংস্কার ও কুপ্রথার পরিবর্তন সাধন করিয়া তাহাদিগকে মানবত্বের মধুর সৌন্দর্যে পরিস্ফুট করিয়াছিল।— সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিতে আমরা কখনই বিস্মৃত হইতে পারি না যে, মধ্যযুগে ইউরোপ আরব মনীষীগণের লিখিত দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি লাভ করিয়া বিশেষরূপে অনুগৃহীত হইয়াছে।"

জার্মান স্কলার এবং ফিলোসফার এমানুয়েল ডাস লিখেছেন, "কুরআন এক অমূল্য গ্রন্থ। ইহারই প্রভাবে আরব জাতি পুরাতন রোম ও গ্রীক সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।— কেবলমাত্র আরব জাতিই কুরআনের পবিত্র প্রভাবে বিজয়ী বেশে ইউরোপ মহাদেশে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কুরআনের প্রভাবেই আবার তাঁহারা এই সমস্ত বিজিত জাতির সহিত একত্রিত হইয়া সমগ্র দেশে দয়ার প্রস্রবন প্রবাহিত করিয়াছিলেন। সমগ্র ইউরোপ যখন অজ্ঞান তার তিমিরে সমাচ্ছন্ন ছিল তখন আরব জাতি কেবল কুরআনের পবিত্র প্রভাবেই গ্রিস দেশীয় বিলুপ্ত প্রায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনরালোচনা করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যজগতে দর্শন, চিকিৎসা, জ্যোতিষ্ক এবং সঙ্গীতবিদ্যার প্রচার করেন। বিজ্ঞানযুগের বর্তমান উন্নতির মূলে কুরআনের প্রভাব যে অলক্ষেই বর্তমান রহিয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

—o—

www.icsbook.info

ISBN 984-8747-69-9